জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড

দ্বিতীয় ভাগ

পরিবর্দ্ধিত দশম সংস্করণ

মৌমাছি

যাদবপুর কলেজ অব্ ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড টেক্‌নোলজির সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডক্টর হীরালাল রায়. এম-আই-কেম্-ই, এ-বি (হার্ভার্ড), ডক্টর, ইং (বার্লিন) লিখিত ভূমিকা সম্বলিত

মিত্র ও ঘোষ

১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

দ্বিতীয় ভাগ

—এক টাকা দশ আনা—

প্রথম সংস্করণ—ডিসেম্বর ১৯৪১
দ্বিতীয় সংস্করণ—জুন ১৯৪২
তৃতীয় সংস্করণ—এপ্রিল ১৯৪৩
চতুর্থ সংস্করণ—ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪
পঞ্চম সংস্করণ—জুলাই ১৯৪৫
ষষ্ঠ সংস্করণ—ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭
সপ্তম সংস্করণ—ডিসেম্বর ১৯৫০
অষ্টম সংস্করণ—ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩
নবম সংস্করণ—ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫
দশম সংস্করণ—ডিসেম্বর ১৯৫৬

মিত্র ও ঘোষ ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে ভানু রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও
নিউ মহামায়া প্রেস ৬৫।৭ কলেজ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীঅবনীরঞ্জন মান্না কর্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

অনুসন্ধিৎসা জীবন্ত মানব মনের স্বাভাবিক বৃত্তি। মন যত দিন সজাগ থাকবে জ্ঞান লাভের পিপাসা তত দিন নিবৃত্ত হবে না। এই ভাবের অভাব হলেই বুঝতে হবে যে মানসিক জড়তা এসেছে। শিশু কথা বলতে শিখবেই, তারা নূতন জগতের পরিচয় লাভের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে এবং প্রশ্নে প্রশ্নে তার আশেপাশের সকল লোককে অস্থির করে তোলে। অনেকে বিরক্ত হয়ে তাকে ভর্ৎসনা ক'রে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেন—কতকটা নিজেদের অজ্ঞতা গোপন করার জন্য, কতকটা আলস্যবশতঃ, কতকটা বা অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকার জন্য। কিন্তু এইভাবে শিশুর জিজ্ঞাসু মনকে দমিয়ে দিলে তার মানসিক উন্নতির বিঘ্ন ঘটানো হয়। এটা কোন প্রকারেই বাঞ্ছনীয় নয়। যথা সম্ভব জ্ঞানলাভে তাকে উৎসাহিত করাই উচিত। কিন্তু এর আর একটা দিকও আছে। অনায়াসলব্ধ জ্ঞান বা বস্তুর প্রতি তেমন শ্রদ্ধা থাকে না;—প্রশ্ন করা মাত্রই উত্তর দিলে শিশুর জ্ঞান বাড়তে পারে, কিন্তু তার চিন্তাশক্তির বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না, চিন্তাশক্তির বিকাশ জ্ঞানলাভের চেয়েও অধিকতর প্রয়োজনীয়। মনের অলসতা দূর করবার জন্য শিশুকে পরিশ্রম করতে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ ভাবে বাধ্য করা দরকার। প্রশ্নের উত্তর তার নিজের চিন্তাশক্তি দিয়ে সমাধান করাতে পারলেই ভাল। যদি তা সম্ভব না হয় তবে অন্ততঃ যেখানে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে সেই ভাণ্ডার তাকে দেখিয়ে দিতে হয়। জগতের সব দেশের ছোটদের জন্যই এই রকম 'জ্ঞান-ভাণ্ডার' লেখা হয়েছে সহজ এবং সরল করে। আমাদের বাংলা ভাষায় এই রকম বইয়ের সংখ্যা খুবই কম। যে দু'চারখানি আছে, তাতে প্রশ্ন-সংখ্যার শেষ নেই, কিন্তু জবাবগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। স্নেহাস্পদ 'মৌমাছি' আনন্দবাজার পত্রিকার 'আনন্দ-মেলা' বিভাগে সাধারণ জ্ঞানের জবাব

দিয়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন, কাজেই তাঁর সঙ্কলিত "জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড" বইটি পড়ার পর একথা আমি বলতে পারি যে এই বই সে অভাব অনেক পরিমাণে দূর করবে। শিশু-সাহিত্যের নতুন নতুন বই প্রকাশিত হচ্ছে, কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই বইগুলির বিষয়নির্ব্বাচন, লিখন প্রণালী, ও রচনা পদ্ধতি প্রশংসনীয় নয়। এই বইটি সেদিক থেকে আমাকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করেছে, কারণ বিজ্ঞানের জটিল তথ্যকে সহজ করে বোঝানোর ক্ষমতা লেখকের প্রাঞ্জল ভাষায় ফুটে উঠেছে—বিষয় নির্ব্বাচন ও পরিকল্পনার দিক থেকেও "জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড" সাধারণ জ্ঞানের একখানি অভিনব বই বলে গণ্য হবে। বইটিতে জ্ঞাতব্য বিষয় যথেষ্ট আছে এবং চিন্তাশক্তিকে তীক্ষ্ণ করার উপযোগী সরঞ্জামও বর্ত্তমান। আশা করি এই বইটি এদেশের ছেলেমেয়ে, তাদের অভিভাবক এবং শিক্ষক-সমাজ সকলের কাছেই আদর পাবে। স্নেহাস্পদ 'মৌমাছি'র পরিশ্রম সার্থক হবে।

কলেজ অব্ ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড টেক্‌নোলজি
যাদবপুর, ১৩।৯।৪১

শ্রীহীরালাল রায়

জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড

দ্বিতীয় ভাগ

(ভারতবর্ষ প্রাচীন)

ভারতবর্ষকে কোন্ জাতি গড়েছে ?

ভারতবর্ষ যাদের দেশ তারা কোন একটি বা দু'টি জাতির সংমিশ্রণে গ'ড়ে ওঠে নি। পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস পড়লে দেখা যায় যে, হাজার হাজার বছর আগে—বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বর্ণের জাতি এদেশে প্রবেশ করেছে। আদি প্রস্তর যুগের মানুষ প্রথম উত্তর পশ্চিম ভারতের গিরিবর্ত্ম দিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিল—এবং প্রথমে তারা সিন্ধু উপত্যকায় বসতি বসায় ও পরে ধীরে ধীরে তারা পশ্চিম ও মধ্যভারতে ছড়িয়ে পড়ে। তক্ষশিলার ধর্ম্মরাজিক মঠে যে সব নরকঙ্কালাবশেষ পাওয়া গেছে তা থেকে খৃষ্টপূর্ব্ব তিন হাজার ও দু'হাজার বছরের মাঝামাঝি সময়কার সিন্ধু সভ্যতার মানুষের নৃতত্ত্বের ইতিহাস যথেষ্ট পাওয়া যায়। উত্তর পশ্চিম দিক দিয়ে যে সব মানুষ ভারতবর্ষে এসেছিল, তাদের মধ্যে অমঙ্গোলীয় ছোটমাথাওয়ালা একটি জাতি ছিল, এই জাতির নিদর্শন মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় পাওয়া গিয়েছে। খৃষ্টপূর্ব প্রায় দু'হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে একদল মানুষের আবির্ভাব হয়, এদের বলা হয় বৈদিক আর্য্য। আর্য্যদের আসবার আগেও এদেশে প্রাগার্য্য মানুষরা বাস করতো—তাদের আর্য্যরা বলতো অনার্য্য। দ্রাবিড়রাই হল ভারতের প্রাচীন অধিবাসী এবং তারাই এককালে ছিল এদেশের মালিক, কিন্তু তাদের চেয়ে অনগ্রসর জাতিদের বাস তারও আগে এদেশে ছিল। একথাও কেউ কেউ বলেন, আর্য্যরা তার বহু পরে এদেশে এলো ; কিন্তু আর্য্যরা একেবারে ও একই সঙ্গে যে সবাই হুড়মুড় করে এসে পড়লো এদেশে, তা ভেবো না।

বহু শতাব্দী ধরে তারা আস্তে আস্তে দলের পর দল বেঁধে, নিজের নিজের গোত্রপতিদের নেতৃত্বে এদেশে এসে ঢুকেছিল। তারপর শকজাতিরাও ভারতের বিভিন্ন জায়গায় উপনিবেশ গড়ে তুললে, রাজ্যপাট বসালে। য়িউচিরাও অনেকদিন ধরে ভারতের পশ্চিমে রাজ্যপাট গড়ে বৌদ্ধধর্ম্ম নিয়ে নিজেদের ভারতীয় নামে পরিচিত করেছিল। তাছাড়া হূন আর গ্রীকরাও যে এদেশে এসে এককালে উপনিবেশ বসিয়েছিল সে কথাও ইতিহাসে পাওয়া যায়। কিন্তু আজ এই সমস্ত জাতির কাউকে আলাদা করে খুঁজে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের বিরাট ভারতীয় সমাজের স্তরে স্তরে কোথায় কোন্ শাখা একটি জাতিতে পরিণত হয়ে মিশিয়ে রয়েছে তা খুঁজে বার করা অসম্ভব। তবে জেনে রাখো, ভারতের সমস্ত জাতিটাকে মোটামুটি সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে নৃতত্ত্বের বিচারে এরাও অমিশ্র মূল জাতি নয়। নেগ্রিটো, প্রোটা-অস্ট্রালয়েড, আলপাইন, মঙ্গোল ও মেডিটারেনিয়ান প্রভৃতি আদিমতম মূল জাতিগুলির সংমিশ্রণে এই সব প্রাচীন জাতির উদ্ভব হয়।

(১) **দ্রাবিড়**—এরাই হলো ভারতের প্রাচীন অধিবাসী—এদের বংশধররাই বর্ত্তমানে মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ, মধ্যপ্রদেশ ও ছোটনাগপুরে বসবাস করে। তামিল, তেলেগু, কর্ণলুটী, মালয়ালম, মুণ্ডা, খন্দ প্রভৃতি সভ্য ও অসভ্য জাতিরাও এই দ্রাবিড়দের মধ্যে পড়ে। এদের গায়ের রং কালো, মাথার খুলি লম্বা ও নিগ্রোদের মত নাক।

(২) **হিন্দু-আর্য্য শাখা**—এরাই হলো আর্য্যদের বংশধর—পাঞ্জাব, রাজপুতানা, কাশ্মীর প্রদেশের জাঠ, রাজপুত ও ক্ষেত্রীরা এই দলে পড়ে। আর্য্যরা ভারতে এসে প্রথম পাঞ্জাবেই বসবাস করে।

(৩) **তুর্ক-ইরাণী শাখা**—ভারতের পশ্চিম সীমান্তবাসী আফগান, ব্রাহুই, পাকিস্তানের বেলুচিজাত, উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তের অধিবাসীরা এই দলে পড়ে—এরা তুর্কী ও ইরাণী জাতির সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে।

(৪) **শক-দ্রাবিড় শাখা**—পশ্চিম ভারতের মারাঠী ব্রাহ্মণ, কুন্‌বী আর কুর্গ জাতির লোকেরা এই শাখায় পড়ে। দ্রাবিড়দের উপর শকেরা যখন আক্রমণ করে. তখন ঐ দু'জাতের সংমিশ্রণে এই নূতন জাতি গড়ে ওঠে।

(৫) **আর্য্য-দ্রাবিড় শাখা**—যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও পূর্ব্ব রাজপুতানার কোনও কোনও অংশে এরা বসবাস করে। 'হিন্দুস্থানী' বলতে যাদের বুঝি তারাই হলো আর্য্য আর দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে তৈরী।

(৬) **মোঙ্গল-দ্রাবিড় শাখা**—ভারতের বাঙালী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও পাকিস্তানের অধীন পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানরা এই শাখায় পড়ে। হিমালয়ের পাহাড়ের পথে মোঙ্গল জাতি এদেশে আসে যখন, তখন দ্রাবিড়দের সঙ্গে মেলামেশার ফলে মোঙ্গল-দ্রাবিড় জাতির সৃষ্টি হয়। বাঙ্গালীরা মোঙ্গলদ্রাবিড় শাখার অন্তর্ভুক্ত হলেও—কোন কোন জায়গায় বাঙ্গালীদের মধ্যে হিন্দু-আর্য্য শাখার রক্ত আছে এ কথাও কেউ কেউ বলেন।

(৭) **মোঙ্গলীয় শাখা**—ভারতের উত্তরে হিমালয়ের উপত্যকায়, নেপাল আসাম প্রভৃতি জায়গায় এদের দেখা যায়। দার্জ্জিলিঙের লেপচা ; নেপালের লিম্বু, মুরমী, গুরুঙ্গ ; আসামের অহোম, বোদো ; পূর্ব্ববঙ্গের কতকগুলি জাতি ও উত্তর বঙ্গের কোচ'রা এই মোঙ্গল শাখার ভিতরে পড়ে।

ভারতবর্ষের নাম হিন্দুস্থান হলো কেমন করে ?

গ্রীকরা ভারতে এসে সিন্ধু নদের তীরে আস্তানা গাড়েন। গ্রীকরা 'সিন্ধু' শব্দটিকে ঠিকমত উচ্চারণ করতে না পেরে বলতেন 'হিন্দ্'। সেই থেকেই ভারতের নাম নাকি হলো 'হিন্দুস্থান'।

ভারতের উপর বিদেশীদের লোলুপ দৃষ্টি কবে সর্ব্বপ্রথম পড়ে ?

প্রাচীনকালে ধনধান্যে ভরা ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যতম সভ্য ও বিত্তশালী দেশ বলে গণ্য হয়েছিল—আর তার অফুরন্ত সম্পদের কথা পাশ্চাত্য জগতের সব জাতেরই কানে পৌছেছিল—এবং সেই লোভেই ভারতবর্ষকে আক্রমণ করার বাসনা সেই আদিমকাল থেকেই বিদেশীদের মনে ছিল। যীশুখ্রীষ্ট

জন্মাবার প্রায় পাঁচশো বছর আগে পারস্যের সম্রাট্ দারিয়ুস ভারতবর্ষ আক্রমণ ক'রে সিন্ধু নদের উপত্যকা দখল ক'রে নেন। এর প্রায় দু'শো বছর পরে খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে ম্যাসিডোনিয়ার গ্রীক সম্রাট্ মহাবীর আলেকজাণ্ডার পারস্য বিজয়ের পর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তাঁর এই ভারত অভিযান দু'বছর ধরে চলে, এবং তিনি পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের অনেক ছোট ছোট রাজ্য জয় করেন। কিন্তু গ্রীকরা এদেশে বেশী দিন আধিপত্য স্থাপন করতে পারেনি। কারণ সম্রাট্ আলেকজাণ্ডার ভারত অভিযান শেষ করে পারস্যে ফেরার পরই ব্যাবিলনে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পরেই পাঞ্জাবের গ্রীক-অধিকৃত রাজ্যে বিপ্লব দেখা দেয়—এবং বিপ্লবীরা গ্রীকদের এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়।

গ্রীকদের ভারত থেকে তাড়ানোর ব্যবস্থায় কোন্ ভারতীয় চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন?

মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মগধ থেকে বিতাড়িত হয়ে পাঞ্জাবে আশ্রয় নেন। তিনিই আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর পাঞ্জাবে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে গ্রীকদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করেন—এবং পরে তিনি পাঞ্জাবের অধিপতি হয়ে মগধ আক্রমণ ক'রে নন্দবংশের উচ্ছেদ করেন। যীশুখৃষ্ট জন্মাবার ৩২১ বছর আগে চন্দ্রগুপ্ত গোটা উত্তর ভারতের অধিপতি হয়ে ভারতের অনেক উন্নতি করেন। আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলুকস চন্দ্রগুপ্তের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য আবার পাঞ্জাব আক্রমণ করেন কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের কাছে হেরে যান এবং আফগানিস্থান, কান্দাহার ও হীরাটের বিনিময়ে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সন্ধি করেন। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সন্ধি শেষ হওয়ার পর পণ্ডিত মেগাস্থিনীস্ ভারতের গ্রীক-দূত হয়ে ভারতে আসেন। তিনি বহুদিন পাটলিপুত্রে (বর্ত্তমান পাটনার কাছাকাছি একটা জায়গায়) ছিলেন ও সেকালের ভারতের রীতি-নীতি, ধর্ম্ম, সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বহু কথা লিখে রেখে গেছেন। তাঁর সেই সব কথা থেকে জগৎ আজ প্রাচীন ভারতের বহু গৌরবের কথা জেনেছে। এই চন্দ্রগুপ্তের নাতি 'অশোকবর্দ্ধন' বা রাজা অশোক ভারতের

আদর্শ সম্রাট ছিলেন—তাঁর রাজত্বকালে ভারত জগতের আদর্শস্থানীয় হয়েছিল। তাঁর রাষ্ট্র-পরিচালনা নীতি—বর্ত্তমানে স্বাধীন ভারত গ্রহণ করেছে।

প্রাচীন ভারতের আর্য্যরা কোথায় কোথায় রাজ্য গড়ে তোলে এবং সেগুলির বর্ত্তমান নাম কি?

আর্য্যরা ভারতে এসে সর্বপ্রথম পাঞ্জাবেই উপনিবেশ গড়ে তোলে—কিন্তু সেখানে থেকে ক্রমশঃ তারা অনার্য্যদের ওপর আধিপত্য বিস্তার ক'রে ভারতের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে ছড়িয়ে প'ড়ে মেলাই ছোট ছোট রাজ্য গড়ে তোলে—তাদের মধ্যে—১। কুরু (দিল্লীর আশপাশ)। ২। পাঞ্চাল (গঙ্গার উৎপত্তি-উপত্যকা) ৩। মৎস্য রাজ্য (জয়পুর) ৪। কোশাম্বী (এলাহাবাদ) ৫। কোশল (অযোধ্যা) ৬। বিদেহ (উত্তর বিহার) ৭। মগধ (দক্ষিণ বিহার) ৮। বঙ্গ (বাঙলাদেশ) ৯। চেদি (বুন্দেল খণ্ড) ১০। বিদর্ভ (বেরার প্রদেশ)।

পর্ত্তুগীজরা কিভাবে সর্বপ্রথম ভারতে আসার পথ আবিষ্কার করে?

তোমরা আগেই জেনেছ মধ্যযুগে পর্ত্তুগীজরাই সবপ্রথম ভারতবর্ষে আসেন, কিন্তু এর গোড়ার ইতিহাসটুকু জেনে রাখা দরকার। খ্রীষ্টীয় ১৫০০ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজরা নৌবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠে—তখন তারা সমুদ্রপথে পৃথিবীর দিকে দিকে অভিযান সুরু করে। ১৪১৫ ও ১৪৬০ সালের মাঝামাঝি সময়টাতে পর্ত্তুগালের 'প্রিন্স হেনরী' বা "হেনরী দি নেভিগেটর" আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল, গায়েনা, সেনেগাল ও গাম্বিয়া প্রভৃতি জায়গার খবর পেয়ে ঐসব দেশ আবিষ্কার করার জন্য অভিযানের পর অভিযান পাঠাতে শুরু করেন। কিন্তু 'প্রিন্স হেনরী' হঠাৎ এই সময় মারা গেলেন, তাতে এ অভিযান সাময়িকভাবে কিছুদিন বন্ধ রইল বটে; কিন্তু পর্ত্তুগীজদের মন থেকে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করার ঝোঁক এতটুকুও কমলো না—ফল হলো কি, তিনি মারা যাবার ২০ বছরের মধ্যেই পর্ত্তুগীজরা বিষুব-রেখা পার হতে সক্ষম হলো—

এবং ৩০ বছরের মধ্যেই উত্তমাশা অন্তরীপ বা 'Cape of Good Hope'বেড় দিয়ে ফিরে গেল। ১৪৮৮ সালে পর্ত্তুগীজ নাবিক বার্থোলোমিও ডিয়াজ (Bartholomew Diaz) এই অভিযানের নেতৃত্ব করেন—কিন্তু নাবিকেরা গোলমাল করায় তিনি কোন দেশে পা না ঠেকিয়েই দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন। এর পরেই 'ভাস্কো ডি গামা' ডিয়াজের পরিকল্পিত সেই জাহাজে চড়েই ভারতে আসার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন—ভারতে আসার পথে তাঁর জাহাজের মাঝিমাল্লারাও গোলমাল বাধিয়েছিল বলে শোনা যায়—তবে তিনি কৌশলে এসব মাঝিমাল্লার দলের সর্দ্দারদের বন্দী ক'রে তাদের সায়েস্তা করেন। ১৪৯৮ সালের ২০শে মে তিনি ভারতের কালিকট বন্দরে এসে নামলেন।

প্রাচীন ভারতে বাণিজ্য-ব্যবস্থা কেমন ছিল ?

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নতি ও খ্যাতি লাভ করেছিল। প্রত্যেক গ্রামেই দু' একজন ব্যবসায়ী বাস করতো, দু'চারখানি গ্রামের এলাকা জুড়ে নির্দ্দিষ্ট দিনে সেখানে হাট বসতো। সেই হাটে কেনাবেচা চলতো, গ্রামের লোকদের বেচাকেনার পর যে মাল পড়ে থাকতো, সেই মাল ফেরীওয়ালারা নিয়ে যেত, কিন্তু পথ ঘাট ভাল ছিল না বলে এক গ্রামের জিনিস অন্য গ্রামে বা অন্যত্র নিয়ে যাওয়া তাই সহজসাধ্য ছিল না। নদীপথে নৌকায় মাল আনার সুবিধা কিছু কিছু ছিল। নদীর ধারে তাই 'গঞ্জ' ব'লে ব্যবসা-কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এছাড়া তীর্থস্থানের কেন্দ্রে বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে বহু যাত্রীর সমাবেশ হতো, তাই তখন বড় বড় মেলা বসতো সেখানে। ঘরোয়া বাণিজ্য ছাড়াও দেশের বাইরের বাণিজ্যেও প্রাচীন ভারত খুবই এগিয়ে ছিল। ঐতিহাসিকেরা বলেন প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ভারতবর্ষের সঙ্গে সুমেরীয়ান দেশগুলির ব্যবসা চলতো এবং এই সম্পর্কে পারস্য উপসাগরেই জগতের প্রথম সামুদ্রিক বাণিজ্য সুরু হয়। প্রমাণ পাওয়া যায় প্রায় তিন হাজার বছর আগে ভারতবর্ষের হিন্দু বণিকরা পূর্ব্ব গোলার্দ্ধে ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে যবদ্বীপ, সুমাত্রা, জাপান, বোর্ণিও ও

সিংহলে ভারতীয় উপনিবেশ বসিয়েছিল। তার চিহ্ন এখনও সেখানকার বহু মন্দির ও প্রাচীন প্রাসাদে রয়েছে। এছাড়া চীন, মালয়, আরব, পারস্য, আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে এবং সেকালের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যকেন্দ্র—আলেকজান্দ্রিয়াতেও হিন্দুরা ব্যবসা বাণিজ্য চালাত।

মধ্যযুগে ভারত মুসলমানদের কবলায়িত হয়। মুসলমানরা রাজ্যজয় ও লুণ্ঠনে বেশী মন দেওয়ায় ভারতের বহির্বাণিজ্য একরকম বন্ধ হয়ে যায়। এই সুযোগে আরবের মুসলমানরা এশিয়া ও য়ুরোপের মাঝপথে থেকে ভারতের বাণিজ্যকে কাজে লাগিয়ে লাভবান হতে থাকে। তারা ভারতবর্ষ ও পূর্ব্ব দ্বীপপুঞ্জ থেকে বাণিজ্য-সম্ভার সংগ্রহ করে মিশরের ভিতর দিয়ে বা মেসোপটমিয়া ও তুর্কীর ভিতর দিয়ে ভূমধ্য-সাগরের কূলে হাজির হতো, সেখানের বন্দর থেকে ভিনিসের বণিকেরা এই সমস্ত জিনিস সস্তা দরে কিনে ইউরোপের বাজারে চড়া দামে বিক্রী করতো। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইভাবে ব্যবসা চলতে থাকে। এই খবর পর্ত্তুগীজদের কানে পৌছাতে না পোঁছাতে তারাও সন্ধান ক'রে ক'রে ভারতে আসার রাস্তা আবিষ্কার করলে।

এরপরেই পর্ত্তুগীজরা আফ্রিকা দিয়ে সমুদ্রপথে ভারতে এসে আরবদের হাত থেকে ভারতের বহির্বাণিজ্য কেড়ে নিলে। পর্ত্তুগীজদের দেখাদেখি ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী আর ইংরেজ সকলেই বাণিজ্য প্রসারের উদ্দেশ্যে এদেশে আসতে লাগল। এই বাণিজ্যের ক্ষমতা লাভ করার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিতর দিয়েই তাদের পরস্পরের মধ্যে রাজ্যজয়ের লোভ দেখা দিল। সেকথা ইতিহাসে পেয়েছ।

প্রাচীন ভারতে কোথায় কি কি বন্দর ছিল?

ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন বন্দর বলতে সিন্ধু নদের তীরে 'পাত্তালা' (Pattala) বন্দরের নামটি জানা যায়। নর্ম্মদার মোহানায় 'বারাইগডা' (বর্ত্তমান বরোদা), মালাবার উপকূলের 'মুসিরিস্' (বর্ত্তমান মহীশূর), কালিকট এবং করোমণ্ডল উপকূলে 'মছলিপট্টম', 'কলিঙ্গপট্টম', সিংহলের

'ত্রিঙ্কোমালি', 'গাল্লো' প্রভৃতি সেকালের প্রাচীন বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র বলে পরিচিত ছিল।

মধ্যযুগের ভারতবর্ষের কোথায় প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল?

মধ্যযুগের ভারতে বাঙলা দেশই ভারতবর্ষের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এর অসংখ্য নদনদী বেয়ে উত্তর ভারতের বাণিজ্য চলতো। 'তাম্রলিপ্ত' 'চাটিগাঁ' 'সাতগাঁ' মধ্যযুগের প্রধান বন্দর ছিল। পরবর্ত্তীকালে যখন সাতগাঁ বন্দরের নদীর জল শুকিয়ে গেল—তখন ভাগীরথীর উপকূলে হুগলীতে পর্ত্তুগীজরা বাণিজ্যের কেন্দ্র গড়ে তোলে—সে সব কথা 'মধুভাণ্ডে'র প্রথম ভাগেই বলেছি।

ভারতের প্রাচীন শিল্পকেন্দ্র ও বাণিজ্য কি ক'রে নষ্ট হলো?

আগেই জেনেছ অন্যান্য বিদেশী জাতের দেখাদেখি ইংরাজরাও এদেশে এসে ইস্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী বলে এক কোম্পানী গ'ড়ে বাণিজ্য করতে স্থরু করে। এই কোম্পানীর রাজত্বের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষ থেকে শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার বিলাতে চালান যেত। এ ব্যবস্থায় এদেশের কারিগর ও শ্রমজীবীরা দু'পয়সা পেত বটে, কিন্তু এ সুখ তাদের বেশী দিন সইলো না। কারণ ইংলণ্ডে ঐ সময়ে নানারকম শিল্পের উন্নতি দেখা দেয়—কাজে কাজেই এদেশের স্বার্থের সঙ্গে সেদেশের স্বার্থের বিরোধ ঘটলো। তখন এদেশ থেকে বহু টাকার রেশম ও সূতার কাপড় চোপড়, চিনি ও মশলা প্রভৃতি ইংলণ্ডে চালান যেত। কিন্তু ইংলণ্ডের নতুন নতুন কলকারখানা গড়ে ওঠার ফলে সেখানেও ঐ সব জিনিস প্রচুর তৈরী হতে লাগল—তখন ইংরেজদের মতলবটা পাল্টে গেল—তারা তখন তাদের দেশে এদেশের জিনিস রপ্তানী না করে তাদের দেশের জিনিস এদেশে আমদানি করার ব্যবস্থা করলে। ইংলণ্ডে নানারকম আইন পাশ করে তারা ইংলণ্ডের বাজার থেকে ভারতের শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভারকে একেবারে হটিয়ে দিলে—ভারতবর্ষের শিল্পবাণিজ্য নষ্ট করার প্রবল প্রচেষ্টা চলতে লাগল। তখন ইংরেজেরা যে সমস্ত আইন করে বিলাতের কলওয়ালাদের বাঁচাবার ও

এদেশের শিল্পপ্রচেষ্টাকে গলাটিপে মারবার চেষ্টা করেছিল—তার জন্য সে যুগের ও পরের যুগের ইংরাজরাও অনেক লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে মতামত প্রকাশ করে গেছেন। এমন কি কোম্পানীর একজন পরিচালকও এসব ব্যাপারে তাঁর তীব্র মতামত লিখে গেছেন। বড় হয়ে সে সব পড়ো।

ভারতে বিখ্যাত নদী 'গঙ্গা'র উৎপত্তি কোন্ জায়গাটিতে?

গাড়োয়াল রাজ্যে হিমালয় গিরিশৃঙ্গের গঙ্গোত্রী নামে জায়গাটিতে গোমুখী নামে এক বরফ-গলা জলের ধারা নেমে এসেছে—এই গোমুখীর ধারাই গঙ্গা বা ভাগীরথী নদী হয়ে ভারতের বুকে প্রবাহিত।

ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থানের নাম কি কি?

হিন্দুরা এই কয়টি স্থানকে পবিত্র মনে করেনঃ-কারণ এই সব জায়গাগুলির সঙ্গে নানারকম দেবতা ও অবতারদের ইতিহাস জড়িত আছে—

(১) পুষ্কর (২) অমরনাথ (৩) বদ্রীনাথ (৪) কৈলাস (৫) হরিদ্বার (৬) বৃন্দাবন (৭) মথুরা (৮) অযোধ্যা (৯) প্রয়াগ ও ত্রিবেণী (কুম্ভমেলার জন্য প্রসিদ্ধ) (১০) গয়া (১১) কাশী (বেনারস) (১২) মাদুরা (১৩) বৈদ্যনাথ ধাম (১৪) গৈবীনাথ (১৫) রামেশ্বর (১৬) পুরী ও ভুবনেশ্বর (১৭) প্রভাস (১৮) কামরূপ (কামাখ্যা) (১৯) চন্দ্রনাথ (২০) বিন্ধ্যাচল (২১) দক্ষিণেশ্বর (২২) নবদ্বীপ (২৩) তারকেশ্বর (২৪) বেলুড় (২৫) কালীঘাট।

শিখদের তীর্থস্থান বলে গণ্যঃ—(১) অমৃতসরের গুরুদ্বার (২) নানকানা সাহেব (গুরু নানকের জন্মস্থান) (৩) পাটনা (গুরুগোবিন্দের জন্ম ও সাধনার স্থান)।

বৌদ্ধদের তীর্থস্থান বলে গণ্যঃ—(১) বুদ্ধ গয়া (২) সারনাথ (৩) কাজরী (৪) লুম্বিনী কানন (৫) রাজগীর (৬) নালন্দা।

জৈনদের তীর্থস্থান বলে গণ্যঃ—(১) পরেশনাথ পাহাড়ের মন্দির (২) কলিকাতার পরেশনাথ মন্দির। (৩) রাজপুতানার আবু পাহাড়।

মুসলমানদের তীর্থস্থানঃ—(১) আজমীর (এখানে খাজা মইনুদ্দিন

চিস্তীর কবর আছে) (২) দিল্লীর জামি মস্‌জিদ্ (৩) গঞ্জ মুরাদাবাদ (এখানে মুসলমান মহাপুরুষ শাহ ফজলুর রহমানের দরগা আছে)।

প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরব জড়িয়ে আছে কোন্ কোন্ জায়গায় ? কোথায় কি আছে ?

আগ্রা—সম্রাট সাজাহানের তৈরী তাজমহল এবং আগ্রা দুর্গের জন্ম বিখ্যাত। দেওয়ান-ই-খাস, মতি-মসজিদ্, দেওয়ান-ই-আম, শিস্‌মহল প্রভৃতি মোগল সম্রাটের বহু কীর্ত্তি এখানে দেখতে পাওয়া যায়, তাছাড়া ইৎমৎদৌল্লা এবং সেকেন্দ্রায় আকবরের কবরও দেখবার মত। আগ্রা থেকে ৩০ মাইল দূরে যমুনার উপকূলে মথুরা সহর—এরই কাছাকাছি 'বৃন্দাবন'। এই দু'টি জায়গাই ভগবান কৃষ্ণের লীলার সঙ্গে জড়িত বলে বহু হিন্দু যাত্রী সেখানে তীর্থ করতে যায়। মথুরায় অনেক মন্দির—তার মধ্যে বিজয় গোবিন্দ, দ্বারকাধীশ ও রাধাকৃষ্ণের মন্দিরই প্রধান। বৃন্দাবনেও অনেক মন্দির আছে; তার মধ্যে গোবিন্দ ও গোপীনাথজীর মন্দিরটি বহু প্রাচীন।

অজন্তা—হায়দারাবাদে একটি গ্রাম—কেন্দ্রীয় রেলের জলগাঁও স্টেশনে থেকে মোটরে করে যেতে হয়। এখানে জঙ্গল ঘেরা পাহাড়ের গায়ে ৩২টি প্রাচীন গুহা আছে। সেই সমস্ত গুহার দেওয়ালে বহু প্রাচীন ছবি আঁকা আছে। এই সব ছবিগুলি আজ থেকে প্রায় ১৫০০ বছর আগে আঁকা হয়েছে—অথচ এত সুন্দর এর কাজ এবং রঙের বাহার, যে এই দেড় হাজার বছরেও বড় বিশেষ নষ্ট হয়নি।

ইলোরা—অজন্তার মতই নিজাম রাজ্যের এটিও একটি দেখবার মত জায়গা, নিজামের রেলপথের আওরাঙ্গাবাদ থেকে এখানে যাওয়া যায় এবং কেন্দ্রীয় রেলের মানমড় স্টেশন থেকে ৭১ মাইল দূরে। এখানে দ্রষ্টব্য হচ্ছে—ভারতের প্রাচীন বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন ভাস্করেরা পাহাড় কেটে গুহার ভিতর যে সব মন্দির ও মূর্ত্তি গড়ে তুলেছিল সেইগুলি। সেই সব মূর্ত্তি ও মন্দির প্রায় ১৩০০ বছর আগে ভারতের শিল্পীরা তৈরী করে গেছেন কিন্তু আজও সেগুলি

ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে। প্রাচীনকালের 'কৈলাস'ও হলো এই জায়গাটি।

সাঁচী—ভূপাল রাজ্যের এলাকায় এই জায়গাটি—এখানে পাহাড়ের উপর ২০০০ বছর আগের বা প্রাচীন বৌদ্ধ যুগের তৈরী স্তূপ আছে। পাহাড়টি ৩০০ ফুট উঁচু। স্তূপটির চারধার পাথরের রেলিং দিয়ে ঘেরা এবং সেই সব পাথরে রকমারী নক্সা ও মূর্ত্তি খোদাই করা আছে।

হরপ্পা—(পাকিস্তানে) পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী জেলায় রাভী নদীর তটভূমিতে ভারতের এই প্রাচীন সহরটিকে খুঁড়ে বার করা হয়েছে। ভারতের এই প্রাচীন সহরটি প্রায় ৫০০০ হাজার বছর আগে তৈরী হয়েছিল বলে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মনে করেন। মণ্টগোমারী বলে জায়গাটি থেকে এটি মাত্র ১৫ মাইল দূরে। মাটি খুঁড়ে এখানে সেই প্রাচীন কালের সহরের নিদর্শন স্বরূপ ঘর, বাড়ী, শস্যশালা প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে।

মহেঞ্জোদারো—(পাকিস্তানে) হরপ্পার মত এটি আর একটি সহর—পাকিস্তান রেলপথের কোট্রি-দাদু-লারকানা শাখায় ডোক্‌রী স্টেশন থেকে সাড়ে আট মাইল দূরে সিন্ধু নদীর তটভূমিতেই এই সহরটিকে খুঁড়ে বার করা হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বলেন যীশুখৃষ্ট জন্মাবার প্রায় ৩০০০ হাজার বছর আগে এই সহরটির অস্তিত্ব বজায় ছিল। মাটি খুঁড়ে মহেঞ্জোদারো সহরের যে নির্ম্মাণ-নৈপুণ্য দেখা গেছে, তাতে আধুনিক যুগের বড় বড় ইঞ্জিনিয়াররাও চমৎকৃত হয়েছেন। কারণ ৫০০০ হাজার বছর আগে ভারতের সভ্যতা যে কত এগিয়েছিল তা সে যুগের শিল্পীদের গড়া এই সহর দেখেই বোঝা যায়। এই সহরের বাড়ী, ঘর, দুয়ার, চওড়া ইটের রাস্তা, কূয়া, নালা-নর্দ্দমা, চৌবাচ্চা প্রভৃতির ব্যবস্থা—এ যুগের তুলনায় কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। তাছাড়া, এই সহর খুঁড়ে বার করার সময় মেলাই প্রাচীন অলঙ্কার, বাসন-কোসনও পাওয়া গেছে। প্রাচীন কালের খেলনা, পুতুল—তারও সন্ধান মিলেছে এইখানে। এই সহর আবিষ্কার

হওয়ার পরে সকলে বুঝেছে যে ভারতবর্ষ কত প্রাচীন সভ্য দেশ।

তক্ষশিলা—(পাকিস্তানে) লাহোর থেকে প্রায় ২০০ মাইল দূরে। এখানেও ভারতের প্রাচীন সভ্যতার অনেক ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। ২৫ বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে প্রাচীন যুগের ভারত অভিযানকারী গ্রীক, শক, কুষাণ ও হুনদের গড়া শহরের নিদর্শন দাঁড়িয়ে আছে। প্রাচীনযুগের বৌদ্ধদের স্তূপ মঠের ভগ্নাবশেষ এখানে আছে।

দিল্লী—দিল্লী ভারতের বর্তমান রাজধানী সেকথা সকলেই জান, কিন্তু এই দিল্লী প্রাচীনকালে থেকেই যে বিভিন্ন সম্রাটের রাজধানী ছিল, সেকথা হয়ত জান না। এখানেই মহাভারতের যুগের রাজধানী 'ইন্দ্রপ্রস্থ' ছিল বলে কেউ কেউ বলেন। মোগল পাঠানরাও এখানে রাজধানী স্থাপন করে গোটা ভারতে রাজত্ব করে গেছেন। সম্রাট সাজাহানের গড়া প্রাসাদ ও দুর্গ, জামি মসজিদ, এছাড়া কুতুবউদ্দীনের তৈরী কুতুব-মস্‌জিদ্ ও কুতুবমিনার প্রভৃতি বহু প্রাচীন স্থপতির নিদর্শন আজও এখানে রয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর সমাধি উদ্যান, মৃত্যুস্থানও এখানকার দ্রষ্টব্য। জায়গাটি কলিকাতা থেকে উত্তর রেলপথে ৯০২ মাইল দূরে।

কাশ্মীর—কাশ্মীর তার প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য ভূস্বর্গ বলে পরিচিত—কাশ্মীরের রাজধানী হলো 'শ্রীনগর'—রাওয়ালপিণ্ডি বা জম্মু থেকে মোটরে শ্রীনগর যাওয়া যায়। কাশ্মীরে দেখবার মত বহু জায়গা আছে—তার মধ্যে গুলমার্গ, ফালগাম, ডাল হ্রদ, উলার হ্রদ ও অমরনাথ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কোণারক—পুরী থেকে ২১ মাইল দূরে বালুস্তূপের উপর জায়গাটি রয়েছে—এখানে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তৈরী সূর্যের মন্দির আছে—মন্দিরটি আগাগোড়া গ্রানাইট পাথরের তৈরী—মন্দিরের গায়ে পাথর কেটে যে-সব মূর্তি ও কারুকার্য্য করা হয়েছে তা ভারতের শিল্পের গৌরব ঘোষণা করছে।

অমৃতসর—শিখদের স্বর্ণমন্দিরের জন্য বিখ্যাত। উত্তর রেলপথের

প্রধান শাখা লাইনে এই সহরটি পড়ে। এখানে 'অমৃত সরোবর' বলে একটি সরোবরের ধারে মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে ব'লেই এর নাম 'অমৃতসর'।

জয়পুর—রাজপুতদের বহু কীর্ত্তি এখানে দেখতে পাওয়া যায়—রাজপুতদের বিখ্যাত অম্বর নগরী এখনও রাজপুতদের প্রাসাদ ও মন্দিরের বহু নিদর্শন বুকে ক'রে এখানে জনশূন্য অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে—এখানে প্রাচীন কালের 'মান মন্দির' বা 'অবজারভেটরী' আছে।

চিতোর গড়—আজমীরের দু'শো মাইল দক্ষিণে আরাবল্লী পাহাড়ের চূড়ার উপরে এক পুরানো শহর এবং রাজপুত রাজত্বের বহু ধ্বংসাবশেষ এখানে দেখতে পাওয়া যায়। রাণা কুম্ভের তৈরী বিজয়স্তম্ভ, মীরাবাঈয়ের মন্দির, পদ্মিনী দেবীর প্রাসাদ এখনও সেকালের সেই বীর রাজপুতদের গৌরব ঘোষণা করছে।

মাদুরা—দাক্ষিণাত্যের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানে 'দেবী মীণাক্ষী'র বিরাট মন্দির আছে, এই মন্দিরটি ৮৪৭ ফুট লম্বা ও ৭২৯ ফুট চওড়া। সেকালে পাথর কেটে যে হাজার স্তম্ভ দেওয়া হলঘর তৈরী করা হয়েছিল, সেটি এখানকার অন্যতম দ্রষ্টব্য।

বারাণসী বা কাশীধাম—কলিকাতা থেকে পূর্ব্ব ও উত্তর রেলপথে ৪৯২ মাইল দূরে হিন্দুদের পবিত্র শহর ও তীর্থস্থান—এখানে বিশ্বেশ্বরের মন্দির, অন্নপূর্ণার মন্দির, ভারতমাতার মন্দির, বেণীমাধবের ধ্বজা বা মিনার এবং আওরঙ্গজেবের মস্‌জিদ্‌ প্রভৃতি বহু দেখবার জিনিস আছে। গঙ্গার তীরে দশাশ্বমেধ ঘাট, মণিকর্ণিকার ঘাট প্রভৃতি ঘাটগুলি সহরটিকে বড় সুন্দর ক'রে সাজিয়ে রেখেছে। বর্ত্তমানে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সেখানে যে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করেছেন, সেটি সারা ভারতের গৌরব বলা চলে। এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে সারনাথ বলে জায়গাটি—সেখানে মাটি খুঁড়ে বৌদ্ধযুগের নিদর্শনস্বরূপ দেড় হাজার বছর আগের বহু ঘর বাড়ী প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এগুলি যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার ৬০০ বছর পরে তৈরী হয়েছিল।

আজমীর—এই জায়গাটি ভারতের বহুপ্রাচীন একটি শহর, তাছাড়া

মুসলমানদের একটি পবিত্র তীর্থস্থান বলেও প্রসিদ্ধ, কারণ এখানে প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ খাজা মইনুদ্দীন চিস্তীর কবরের ওপর বিরাট দরগা আছে। এখান থেকে ৭ মাইল দূরে হিন্দুদের তীর্থ 'পুষ্কর হ্রদ' দেখতে পাওয়া যায়।

লক্ষ্ণৌ—এটিও একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক শহর। ভারতের প্রসিদ্ধ শহরগুলির মধ্যে এটি চতুর্থ স্থান অধিকার করে। এখানে গেলে লোকে জামি মস্‌জিদ্, মচ্ছিভবন, ইমামবাড়া, হুসেনাবাদ, দিলখুসা ও কাইজার বাগ প্রভৃতি জায়গাগুলিও দেখে আসে। কারণ সেখানে অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। কলিকাতা থেকে মাত্র ৬১৬ মাইল দূরে পূর্ব্ব ও উত্তর রেলপথে যাওয়া যায়।

ফতেপুর সিক্রী—আগ্রা থেকে ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত এই শহর ১৬০৯ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ আকবর গড়ে তোলেন—এখানে সেখ সালিম চিস্তীর কবরের ওপর যে মস্‌জিদ্ গড়ে তোলা হয়েছিল, সেটি এবং আকবরের বেগমদের প্রাসাদ, পাঁচমহল, হিরণ-মিনার, বুলান্দ দরওয়াজা (বিজয় তোরণ) প্রভৃতি বহু মোগল স্থপতির নিদর্শন রয়েছে।

হরিদ্বার—যেখানে গঙ্গা পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে শ্যামলা পৃথিবীকে উর্ব্বরা করার ব্রত নিয়েছে এটি ঠিক সেই জায়গায় অবস্থিত। এখানে 'গঙ্গাদ্বার' মন্দির, 'হর-কি-পায়ের' বা 'হরির চরণ' ঘাট হিন্দুদের তীর্থস্থান। উত্তর রেল-পথের সাহারাণপুর রেল-স্টেশন থেকে ৫৯ মাইল দূরে। হরিদ্বারে যাত্রীরা কন্‌খল, হৃষিকেশ, লছমনঝোলা প্রভৃতি তীর্থস্থানও দেখে আসে, কারণ ঐগুলি হরিদ্বারের কাছাকাছি অবস্থিত।

রাজগীর বা রাজগৃহ—বৌদ্ধযুগের এক প্রাচীন শহর এবং বৌদ্ধদের তীর্থস্থান—পূর্ব্ব-রেলপথের বখতিয়ারপুর জংসনে নেমে বখতিয়ারপুরবিহার-লাইট-রেলওয়ের শাখা লাইনে ৩৩ মাইল গেলেই এই জায়গা দেখতে পাওয়া যায়। এখানে বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। এরই কাছাকাছি প্রাচীনকালের 'নালন্দা' শহর।

ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম কোথায় বিশ্ববিত্থালয় স্থাপিত হয় ?

ইংরেজ রাজত্বে সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা, বোম্বাই আর মাদ্রাজ এই তিনটি জায়গাতে বিশ্ববিত্থালয় স্থাপিত হয়—সেটা হচ্ছে ১৮৫৭ সালে। ভারতবর্ষের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিত্থালয় থেকেই সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় নাম করা কৃতী ছাত্র বেরিয়েছে। ১৯৫৭ সালে ভারতীয় বিশ্ববিত্থালয়ের শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়।

ভারতের 'স্বাধীনতা দিবস' ২৬শে জানুয়ারী আমরা পালন করি কেন?

১৯২৯ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, এবং সেই অনুসারে তখনকার কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ১৯৩৫ সালের ৬ই জানুয়ারী ঘোষণা করেন যে ২৬শে জানুয়ারী 'স্বাধীনতা দিবস' পালন করা হবে। সেই থেকেই প্রতি বছর ২৬শে জানুয়ারী আমরা দেশকে স্বাধীন করবার শপথ গ্রহণ করে 'স্বাধীনতা দিবস' পালন করতাম কিন্তু ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়, সেই কারণে, তারপর থেকে ১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করা হয়। আর ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষকে স্বাধীন রিপাবলিক বা 'প্রজাতন্ত্র' হিসাবে ঘোষণা করা হয় বলেই, ২৬শে জানুয়ারী হয়ে গেছে প্রজাতন্ত্র দিবস।

ভারতবর্ষের রেলপথ কবে কি ভাবে সুরু হয় ?

ইংলণ্ডের বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার মিঃ আর এম স্টিফেন্স, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তাদের কাছে ভারতবর্ষে রেললাইন গড়ে তোলার প্রস্তাব জানান। ১৮৪৪ সাল থেকে রেলপথ গড়ার চেষ্টা চলে। সেই অনুসারে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে ১৮৫৩ সালের ১৮ই এপ্রিল ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম রেললাইন খোলেন। বোম্বাই থেকে থানা পর্য্যন্ত এই রেলপথের তখন মোট মাপ ছিল মাত্র পৌনে বাইশ মাইল। এর পরেই ১৮৫৪ সালের ১৫ আগস্ট ইস্ট ইণ্ডিয়ান-রেলওয়ে-কোম্পানী বাঙ্গালাদেশে হাওড়া থেকে হুগলী পর্য্যন্ত ১৩ মাইল রেলপথ খোলেন।

থেকেই সেখানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তেল সংগ্রহের ব্যবস্থা হয় এবং ১৮৯১ সালে বার্মা-অয়েল-কোম্পানী গড়ে ওঠে।

ভারতের কাঁচশিল্পের প্রাচীন ইতিহাস কি ?

প্রত্নতত্ত্ববিদরা মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে ভারতের নানা জায়গায় কাঁচের জিনিসের চিহ্ন পেয়েছেন বটে তবে সে সব কাঁচের জিনিস ইউরোপের কাঁচের জিনিসের তুলনায় তেমন কিছুই নয়। প্রাচীন কালে এদেশে কাঁচের চুড়ি ও সামান্য সামান্য শিশি বোতল তৈরী হতো তার প্রমাণ আছে। বর্ত্তমানে ভারতের যে 'কাঁচশিল্প' গড়ে উঠেছে তার সূত্রপাত হয় ১৮৯০ সাল থেকে। ১৮৯০ সাল থেকে ১৯১৩ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে ১৬টি কাঁচের কারখানা খোলা হয়েছিল কিন্তু এর অনেকগুলিই স্থায়ী হতে পারেনি।

ভারতবর্ষে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয় কবে এবং কোথায় ?

১৮৫৪ সালে বোম্বাই শহরে পার্শী ব্যবসায়ী কাওয়াসজী নানাভাই ডাভারের উদ্যোগে ভারতবর্ষে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। তার পরের দশ বছরের মধ্যেই ১২টি কাপড়ের কল গড়ে ওঠে। এরপর থেকেই ক্রমশঃ কাপড়ের কলের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এখন ভারতে আছে প্রায় চারশো কল।

ভারতে প্রথম সিমেণ্টের কারখানা গড়ে ওঠে কবে ?

১৯০২ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে সাউথ ইণ্ডিয়া ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড্ এদেশের প্রথম সিমেণ্ট তৈরীর কারখানা খোলেন। তবে কারখানাটি ছোট হওয়ায় ও খরচ বেশী পড়ায় কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ১৯১২ সালে ভারতীয় সিমেণ্ট কোম্পানী লিমিটেডের কাজ আরম্ভ হয় পোরবন্দরে। বর্ত্তমানে প্রায় ২৩টি সিমেণ্টের কারখানা ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছে, এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে ৪৪ লক্ষ টন সিমেণ্ট তৈরী হয়েছে।

ভারতবর্ষে 'কয়লার খনি'র সন্ধান কবে পাওয়া যায় ?

বাঙলাদেশে রাণীগঞ্জের কয়লার খনি এলাকাতেই, ১৮৫৪ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া

বর্ত্তমান ভারতে মোটামুটি কত মাইল রেলপথ আছে ?

ভারতের সব জায়গাতেই এখন রেলপথ মারফৎ যাওয়া আসা করা যায় এবং অবিভক্ত ভারতবর্ষে প্রায় ৪১ হাজার মাইলের মত রেলপথ বিস্তার লাভ করেছিল। কিন্তু ভারত বিভক্ত হওয়ায় ভারতের অংশে পড়ে ২৬২৫৫ মাইল রেলপথ—বাকিটা পড়ে পাকিস্তানের ভিতরে। কিন্তু এই কয় বছরে (১৯৫৫ সাল পর্য্যন্ত) ভারতের রেলপথ বিস্তার লাভ ক'রে হয়েছে প্রায় ৩৫ হাজার মাইল।

ভারতবর্ষে কাগজ কবে প্রথম তৈরী হয় ?

ভারতের নিজস্ব কাগজ তৈরীর ইতিহাস সঠিক জানা যায় না—তবে সেকালে তুলা থেকে যে 'তুলোট' কাগজ তৈরী হতো তার প্রমাণ অনেক পুরানো পুঁথি পত্তরে পাওয়া গেছে। তবে বিলাতী ধরণের কাগজ সর্ব্বপ্রথম এদেশে তৈরী হয় ১৭৬১ সালে, দিনেমারদের রাজ্য মাদ্রাজের তাঞ্জোর জেলায়। কাগজ তৈরীর কল সর্ব্বপ্রথম এদেশে আনেন শ্রীরামপুরে পাদ্রী কেরী সাহেব, তারপর বালীতে ১৮৬৭ সালে কাগজের কল গড়ে ওঠে, সেটির নাম ছিল রয়াল পেপার মিল। তারই যন্ত্রপাতি কিনে নিয়ে ১৮৮২ সালে টিটাগড় পেপার মিল গড়ে ওঠে।

ভারতবর্ষে প্রথম চটকল কোথায় এবং কবে হয় ?

১৮৫৫ সালে রিসড়াতে (শ্রীরামপুর) প্রথম পাটের সূতা তৈরী করার উপযোগী কারখানা গড়ে ওঠে।

ভারতবর্ষে পেট্রোল ও কেরোসিন তেলের খনি আবিষ্কার হয় কবে?

আসামের মাটির তলায় যে তেল আছে—এ কথাটা জানা যায় সর্ব্বপ্রথম ১৮৬৬ সালে ; কিন্তু সেখানে তেল সংগ্রহ করার ব্যবস্থা সুরু হয় ১৮৯৯ সালে —তখনই আসাম অয়েল কোম্পানী গড়ে ওঠে। আসামের তেলের খনির আবিষ্কার হওয়ার আগে বর্ম্মার তেলের খনি থেকে তেল পাওয়া যেত—কিন্তু সেখানেও তেল সংগ্রহের তেমন কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা ছিলনা। ১৮৮৭ সাল

কোম্পানী কর্ত্তৃপক্ষ প্রথম কারবারী ধরণে খাদ কেটে কয়লা বিক্রী করবার ব্যবস্থা করেন। তার বহুপরে ১৮৯৪ সালে ঝরিয়ায় কয়লার খনির সন্ধান পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে প্রথম কবে জীবন বীমা করবার প্রথা চলিত হয়?

১৭৯৩ সালে উইলিয়ম ইন্সিওরেন্স কোম্পানী নামে এক কোম্পানী খোলা হয় এদেশে। এটাই হলো ভারতবর্ষের প্রথম ইন্সিওরেন্স কোম্পানী।

ভারতবর্ষে 'রেডিও'র ব্যবস্থা কবে সুরু হয়? বর্ত্তমানে ভারতের কোথায় কোথায় বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

১৯২২ সালে মাদ্রাজের "রেডিও ক্লাবের" সহযোগিতাতেই ভারতবর্ষের 'বেতার' ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়—তারপর ১৯২৭ সালের ২৩শে জুলাই ইণ্ডিয়ান ব্রড কাস্টিং কোম্পানী বোম্বাই শহরে প্রথম 'বেতার-কেন্দ্রে'র কাজ আরম্ভ করেন। এর ১ মাস পরে ২০শে আগস্ট কলিকাতার 'বেতার-কেন্দ্রে' কাজ সুরু হয়। ১৯৩০ সালে ঐ কোম্পানী অচল হয়, সেই সময় ভারত গবর্ণমেণ্ট তার ভার গ্রহণ করেন। ১৯৩৬ সালের ৮ই জুন ভারতীয় বেতারের নাম বদলিয়ে All India Radio (A.I.R.) রাখা হয়। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের বেতার ব্যবস্থা এশিয়ার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। স্বাধীন ভারতে এপর্য্যন্ত (১৯৫৪) মোট ২২টি বেতার-কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে—দিল্লী, কলিকাতা, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, বোম্বাই, ত্রিচিনাপল্লী, জলন্ধর, অমৃতসর, পাটনা, কটক, গৌহাটি, নাগপুর, বিজয়ওয়াড়া, বরোদা, এলাহাবাদ, আমেদাবাদ, বাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ, ঔরঙ্গাবাদ, মহীশূর, ত্রিবান্দ্রাম ও কালিকট।

ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম সিনেমার ছবি তোলেন কে? কি এবং কবে?

ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম সিনেমার ছবি তোলেন ডি. ফাড়কে। ছবিটির নাম 'হরিশচন্দ্র'; ১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে বোম্বাইয়ের করোনেশন সিনেমাতে ছবিটি দেখানো হয়। প্রথম সবাক ছবি 'আলম আরা' বোম্বাইয়ের ইম্পিরিয়াল স্টুডিওতে তোলা হয় এবং ১৯৩১ সালের ১৪ই মার্চ্চ প্রথম দেখানো হয়।

ভারতের প্রাচীনতম 'সাহিত্য সৃষ্টি' কি ?

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সাহিত্য বলতে বিভিন্ন বেদগুলি বুঝায়—এই বেদগুলিই হলো জগতের প্রথম সাহিত্য—প্রমাণ পাওয়া যায় এই বেদগুলি রচিত হওয়ার অনেক পরে জগতের অন্যান্য দেশে সাহিত্যের জন্ম হয়।

ভারতবর্ষের মধ্যে ক্রীশ্চানদের সবচেয়ে পুরানো গির্জ্জা কোন্‌টি ?

বর্ত্তমানে হুগলী জেলার ব্যাণ্ডেল বলে জায়গাটিতে 'ব্যাণ্ডেল গির্জ্জা' বলে যে গির্জ্জাটি দেখা যায়—সেইটিই পূর্ব্ব ভারতের সবচেয়ে পুরানো গির্জ্জা—সম্রাট্‌ আকবরের রাজত্বকালে ১৫৫৯ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজ নাবিক, পাদরী ও ব্যবসাদাররা মিলে এই গির্জ্জাটি স্থাপন করে। ১৬৩১ সালে মোগলদের আক্রমণে এই গির্জ্জাটির বিশেষ ক্ষতি হয় কিন্তু ১৬৩৭ সালে আবার তাকে নতুন করে গড়া হয়। সেই গির্জ্জাটি এখনও সেই সব পুরানো স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে যীশুখৃষ্ট-ক্রোড়ে যে মাতৃমূর্ত্তি আছে তা ভারি সুন্দর—এবং অনেক লোক তাই দেখতে সেখানে যায়।

ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত ও বড় মন্দির কোন্‌টি ?

ভারতবর্ষে যত মন্দির আছে তার মধ্যে মাদুরার মন্দিরই সবচেয়ে বড় ও সুন্দর। এই মন্দিরের ন'টি গম্বুজের মধ্যে একটি গম্বুজ ১৫২ ফুট উঁচু।

ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বড় মসজিদ কোন্‌টি ?

দিল্লীর জামি মসজিদই ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বড় মসজিদ—এই মসজিদটি ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্‌ সাজাহান আরম্ভ করেন ও ১৬৫৮ সালে এই মসজিদটি তৈরী শেষ হয়।

ভারতের মধ্যযুগের হিন্দু স্থপতি-শিল্পীদের তৈরী প্রাসাদ-শিল্পের নমুনা অটুট অবস্থায় কোথায় বর্ত্তমান আছে ?

প্রাচীন হিন্দু স্থপতি-শিল্পীদের গড়া প্রাসাদের যেটি অটুট থেকে তাঁদের গৌরব ঘোষণা করছে—সেটি হচ্ছে উদয়পুরের 'বিজয় স্তম্ভ'। এটি ১৪৪২ সালে তৈরী হয়েছিল।

ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় তোরণ বা 'গেট' কোন্‌টি ?

আগ্রা থেকে কিছুদূরে 'ফতেপুর সিক্রী' বলে জায়গাটিতে আকবর তাঁর খান্দেশ বিজয়ের গৌরবকে অমর করে রাখতে 'বুলান্দ দরওয়াজা' বলে এক তোরণ তৈরী করেন। এটি ১৭৬ ফুট উঁচু। সারা পৃথিবীতে এত বড় 'তোরণ' বা গেট কোথাও নেই।

ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'সমাধি-মন্দির' কি ?

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমাধি-মন্দির আগ্রার 'তাজমহল'। ১৬৩২ সালে সম্রাট শাজাহান তাঁর মহিষী মমতাজের কবরের উপর এই স্মৃতিমন্দির গড়ার কাজ শুরু করান, কিন্তু কাজ শেষ হয় ১৬৫৩ অব্দে। এটি তৈরী করতে ২০ হাজার মিস্ত্রী ও মজুরের প্রায় ২২ বছর সময় লেগেছিল ও খরচ হয়েছিল ৩ কোটি টাকা। ওস্তাদ ইসা বলে একজন আর্ফান্দি তুর্কী কারিগর এর পরিকল্পনা করেন। এটি একটি জগৎ প্রসিদ্ধ 'সমাধি-মন্দির'। তাজমহলের মাঝখানের গম্বুজ ১১৭ ফুট উঁচু ও লম্বা চওড়া ১৫১ ফুট।

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মণি 'কোহিনুরের' ইতিহাস কি ?

অল্প কথায় 'কোহিনূর' হীরকের ইতিহাস বলতে হলে এইটুকু জেনে রাখলেই যথেষ্ট—১৩০৩ খৃঃ অব্দের পর থেকে কয়েক শতাব্দী ধরে 'কোহিনুর' মণি ছিল 'মালোয়া' বা মালব রাজ্যের রাজাদের সম্পত্তি। সেখান থেকে এটি চলে আসে দিল্লীর রাজকোষে। তারপর ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে নাদির শাহ যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন ঐ হীরকটি লুট করে নিয়ে যান। শিখ অভ্যুত্থানের পর নাদির শাহের বংশধরদের কাছ থেকে সেটি আবার রণজিৎ সিংহের হাতে আসে। তারপর রণজিৎ সিংহের বংশধররা সেটি উপহার দেন রাণী ভিক্টোরিয়াকে—সেই থেকেই সেটি ইংরেজের দখলে আছে।

ভারতবর্ষের গৌরব টাটার কারখানা কবে স্থাপিত হয় ?

টাটার লোহার কারখানা স্থাপিত হয় ১৯০৯ সালে, কিন্তু লোহা তৈরী হয়ে বার হয় সর্ব্বপ্রথম ১৯১১সালে। এইটি শুধু ভারতের নয়, প্রাচ্যের বড় কারখানা।

প্রজাতন্ত্র ভারত

স্বাধীন ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের সূচনা কিভাবে হলো ?

১৯৪২ সালে মার্চ ও এপ্রিল মাসে—যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানীরা ভারতের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো—এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের গড়া আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতাপের কথা বৃটেনবাসীদের কানে পৌছালো—তখন তদানীন্তন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চার্চিল সাহেব—স্যার স্ট্র্যাফোর্ড ক্রীপসকে এদেশে পাঠালেন। তিনি প্রচার করলেন যে—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমস্যার চূড়ান্ত ও ন্যায্য সমাধান নিয়ে ক্রীপ্‌স্ সাহেব ভারতে এসেছেন। ক্রীপস সাহেব তিন সপ্তাহকাল ধরে ভারতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেন, কিন্তু ফল কিছুই হলো না, কারণ মহাত্মা গান্ধী ক্রীপ্‌স্ আনীত প্রস্তাবগুলি যে আসলে মস্ত ফাঁকি সে কথা বেফাঁস করে দিলেন।

ক্রীপ্‌স প্রস্তাব ব্যর্থ হওয়ার পর বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে—মহাত্মা গান্ধী বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে এদেশ থেকে রাজ্যপাট গুটিয়ে স্বদেশে ফিরে যাওয়ার চূড়ান্ত নির্দ্দেশ ঘোষণা করলেন। এই প্রস্তাব 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে পরদিন প্রায় ভারতের সর্ব্বত্র—কংগ্রেসের নেতাদের গ্রেপ্তার করা হলো। নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সারা ভারতে এক বিপ্লব আন্দোলন দেখা গেল। এই বিপ্লব আন্দোলন 'আগস্ট আন্দোলন' নামে খ্যাত হলো।

তারপর ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের বিজয় ঘোষিত হওয়ার পর ১৯৪৫ সালের ১৪ই জুন ভারতের তদানীন্তন ভাইসরয়, লর্ড ওয়াভেল সমস্ত নেতাদের মুক্তির নির্দ্দেশ দিলেন—এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের আলোচনার জন্য সিমলায় আমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু মুসলীম লীগের নেতা মিঃ জিন্না লর্ড ওয়াভেল ও-অন্যান্য নেতাদের উদ্ভাবিত সমাধানকে মেনে নিতে অস্বীকৃত হওয়ায়—সিমলা আলোচনাও পণ্ড হলো। ১৯৪৫ সালের ২৬শে আগস্ট লর্ড ওয়াভেল দ্বিতীয়বার বিলাতে গেলেন, সেখান থেকে ফিরে এসে

১৯শে সেপ্টেম্বর তিনি বেতার মারফৎ ঘোষণা করলেন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত-শাসিত স্বাধীনরাষ্ট্র হিসাবে গঠিত করার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত। ইতিমধ্যে ঐ বছরের নভেম্বর মাসেই নেতাজী গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজের অধিনায়কদের ভারতে এনে বিচার স্থরু হলো, তাতেই নেতাজীর কর্ম্মদক্ষতায় ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের পথ কতখানি প্রশস্ত হয়েছে, জনসাধারণ ও এদেশের নেতারা তা অনুভব করলেন। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী এবং নৌবাহিনীর মধ্যেও সাড়া জাগলো। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বোম্বাই পোতাশ্রয়ে ভারতের রাজকীয় নৌবহরের নাবিকরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলো, অবশেষে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যস্থতায় সে বিদ্রোহ শান্ত করা হলো। ওদিকে ঠিক সেই সময়ে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে রক্ষণশীল দলদের হারিয়ে দিয়ে, সেখানকার শ্রমিকদলের প্রতিনিধিরাই রাষ্ট্রশাসনক্ষমতা হস্তগত করলেন। শ্রমিকদলের নেতা মিঃ এটলী ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হলেন—এবং তিনি নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন।

১৯৪৬ সালের ১৫ই মার্চ ইংলণ্ডের শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের মুখপাত্র রূপে প্রধান মন্ত্রী মিঃ এট্‌লী ঘোষণা করলেন যে, ভারতবর্ষ ইংরাজের রাষ্ট্র-সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত থাকবে কিনা, সেটুকু স্থির করার অধিকার ভারতবর্ষের জনসাধারণের আছে এবং তারা যদি স্বাধীনতা চায়, তাহলে অবিলম্বেই যথাসম্ভব সহজে ও বিনা সংঘর্ষে—ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার ব্যাপারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যথাসম্ভব সহযোগিতা করাই উচিত। এই উদ্দেশ্যে ঐ মন্ত্রিসভা ১৯৪৬ সালের মার্চ্চ মাসে ভারতের নেতা ও জনসাধারণের মনের ইচ্ছাটা জানবার জন্য কয়েকজন মন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতাকে মন্ত্রিসভার প্রতিনিধিরূপে ভারতবর্ষে পাঠালেন। এই 'মন্ত্রীমিশন' সাড়ে তিন মাস ধরে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ ও রাজ্য ঘুরলেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেন, এবং সেই অনুযায়ী তাঁরা একটি পরিকল্পনাও তৈরী করে ১৬ই মে তারিখে সকলের সামনে উপস্থিত করলেন। এই

পরিকল্পনাটি মুসলিম লীগ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করলেন, কিন্তু শিখেরা বাতিল করলেন, আর দেশীয় রাজ্যের রাজা ও শাসকরা এই পরিকল্পনাকে আংশিক ভাবে গ্রহণ করলেন। এই অবস্থাতেই ১০ই জুন বৃটিশমন্ত্রিসভা ভারত শাসনের ক্ষমতা এক অন্তর্ব্বর্ত্তী-কালীন গবর্ণমেণ্টের হাতে অর্পণ করবার কথা ঘোষণা করলেন এবং নূতন রাষ্ট্রকাঠামো লিপিবদ্ধ করার জন্য গণপরিষদ গঠনের নির্দ্দেশ দিলেন। মুসলীম লীগ এই অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন গভর্ণমেণ্টে যোগদান করবার সিদ্ধান্ত করলেন, কিন্তু ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক দল কংগ্রেসীদল, ১৬ই মে তারিখের ঘোষিত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাটি সমর্থন ক'রে, পরবর্ত্তী পরিকল্পনাকে অগ্রাহ্য করলেন ও অন্তবর্ত্তীকালীন গভর্ণমেণ্টে যোগদান করতে রাজি হলেন না। মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনাও প্রায় অচল হয়ে উঠলো। যাই হোক, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁদের বেতনভোগী পদস্থ কর্ম্মচারীদের নিয়ে ভারত শাসনের উদ্দেশ্যে এক অস্থায়ী ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করলেন।

১৯৪৬ সালের ২৯শে জুলাই মুসলীম লীগ দল সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনা ও প্রস্তাবগুলি অস্বীকার করলেন, এবং "ডাইরেক্ট এ্যাকসন" বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (সরাসরি প্রতিকারের পথ অবলম্বন) করবার সিদ্ধান্ত করলেন। ১২ই আগস্ট ভারতের ভাইসরয়, কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনায় অন্তর্ব্বর্ত্তী-কালীন গভর্ণমেণ্ট কি ভাবে গঠন করা যায়, সেই আলোচনার জন্য পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুকে আমন্ত্রণ করলেন। ১৬ই আগস্ট মুসলীম লীগ 'ডাইরেক্ট এ্যাকসন' বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ করায় কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মারামারি ও খুন-জখম লুটপাট সুরু হয়ে গেল—এবং সারা ভারতে তার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। হাজার হাজার স্ত্রী পুরুষ মারা গেল—বহু লোকের যথাসর্ব্বস্ব খোয়া গেল।

১৯৪৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর পণ্ডিত জহরলাল জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতাদের নিয়ে অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন গভর্ণমেণ্ট গঠিত করেন। এর প্রায় এক মাস পরে ১২ই অক্টোবর, মুসলীম লীগ আবার অন্তবর্ত্তীকালীন গভর্ণমেণ্টে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ১৪ই অক্টোবর পূর্ব্ববাঙলার নোয়াখালি ও

ত্রিপুরা জেলায় দাঙ্গা হাঙ্গামা ও লুটতরাজের হিড়িক পড়ে গেল—ও ২৫শে অক্টোবর বিহারেও সাংঘাতিক রকমের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে গেল। এই অরাজকতা বেশ কয়েকদিন ধরে চলতে লাগলো। ওদিকে অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন গভর্ণমেণ্টে যোগ দিলেও মুসলীম লীগ প্রতিনিধিরা কেন্দ্রের গঠিত বিধান পরিষদ বা কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলীতে যোগ দিলেন না। তার ফলে নূতন সমস্যা দেখা দিলো, এবং ১৯৪৬ সালের ৩০শে নভেম্বর ওয়াভেল সাহেব পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ও জনাব লিয়াকৎ আলি খাঁকে বিলেতে নিয়ে গেলেন—বৃটিশ মন্ত্রিসভার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য। কোনও মতে মীমাংসা না হওয়া সত্ত্বেও, ১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর নবগঠিত বিধান-পরিষদের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হলো। ১৯৪৭ সালের ২৪শে জানুয়ারী পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভয়ঙ্কর রূপে দেখা দিল! হাজার হাজার লোক মারা গেল। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করলেন যে তাঁরা লর্ড ওয়াভেলকে সরিয়ে নিয়ে, লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতের বড়লাট করে পাঠাবেন। ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করলেন, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের আগেই দায়িত্বশীল ভারতীয় নেতাদের নিয়ে গঠিত গভর্ণমেণ্টের হাতে ভারত-শাসন ক্ষমতা সম্পূর্ণ রূপে অর্পণ করা হবে। এই ঘোষণাই ভারতের স্বাধীনতার সর্ব্বপ্রথম ঐতিহাসিক ঘোষণা। কিন্তু যেভাবে তখন কলকাতা, পাঞ্জাব ও পূর্ব্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ দেখা গেল, তাতে অবস্থা ক্রমশঃই আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে লাগলো। ঠিক তেমনি সময়, ১৯৪৭ সালের ২৪শে মার্চ্চ—লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারতের বড়লাট হয়ে এদেশে এলেন। এসেই তিনি এদেশের অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করে বিদ্যুৎগতিতে নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ চালাতে লাগলেন।—এবং বৃটিশ মন্ত্রিসভাকে সেই সেই মত পরামর্শ দিতে মে মাসের শেষে বিলেতে গেলেন। ফলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ৩রা জুন তারিখে ঘোষণা করলেন—যে ভারতের অধিবাসীরা যদি মনে করেন যে, একটি মাত্র বিধান পরিষদের দ্বারা স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র

পরিচালনা-বিধি গঠিত হওয়া সম্ভব নয়—অপর একটি গঠন পরিষদ বা বিধান-পরিষদেরও প্রয়োজন আছে, তবে ভারতবাসীরা যেন সেই কথাই ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় কথা তাঁরা জানালেন যে 'ভারত স্বাধীনতা বিধানানুসারে', ভারতবর্ষ—ভারত ও পাকিস্তান এই দুই ডোমিনিয়নেও বিভক্ত হতে পারে। তৃতীয় ঘোষণা হলো যে ভারতবাসীরা পাঞ্জাব ও বাঙলাকে বিভক্ত করাই যদি সাব্যস্ত করেন, তবে সে কাজটিও দেড় মাসের মধ্যে তাঁদের শেষ করে ফেলতে হবে।

১৯৪৭ সালের ১৬ই জুন 'এ-আই-সি-সির' সভায় কংগ্রেসের নেতারা—বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ৩রা জুনের ঘোষণা অনুযায়ী ভারতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করণের নূতন পন্থাই মেনে নিলেন, মুসলিম লীগও এই পন্থা মেনে নিলেন।

১৯৪৭ সালের ৪ঠা জুলাই বৃটিশ পার্লামেণ্টে ভারত স্বাধীনতা বিল উত্থাপন ক'রে বৃটিশ মন্ত্রিসভা ঘোষণা করলেন যে—"১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ—ভারত ও পাকিস্তান এই দুই ডোমিনিয়ন রাষ্ট্রে বিভক্ত হবে। এই ঘোষণাই পরে ১৮ই জুলাই রাজার স্বাক্ষরিত হয়ে পাকাপাকিভাবে "ভারত স্বাধীনতা" বিধান এই আইনে পরিণত হলো।

১৯৪৭ সালের ১৪ই ও ১৫ই আগস্টের সংযোগ মুহূর্ত্তে ভারতবর্ষ ভারত ও পাকিস্তান এই দুই ডোমিনিয়নে বিভক্ত হলো। দুটি গণ-পরিষদ গড়ে উঠলো, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁদের ভারত শাসন ক্ষমতাটা এই দুই ডোমিনিয়নের হাতে বণ্টন করে দিলেন। ভারত ও পাকিস্তানের দুইটি আলাদা বিধান-পরিষদ ও মন্ত্রিসভা সেইদিন গঠিত হলো।

ভারত ডোমিনিয়নের ভারপ্রাপ্ত বিধান পরিষদের প্রথম সভাপতি ও বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী কে কে হলেন?

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট স্বাধীন ভারত ডোমিনিয়নের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচিত হলেন—পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু। তিনি নিজে নিলেন বৈদেশিক সংযোগ ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি বিভাগের ভার। বিধান পরিষদের প্রথম

সভাপতি হলেন—ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ। এছাড়া অন্যান্য মন্ত্রী হলেন—(১) সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল (স্বরাষ্ট্র ও দেশীয় রাজ্য-দপ্তর) (২) জয়রাম দাস দৌলতরাম (কৃষি ও খাদ্য দপ্তর) (৩) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (শিক্ষা ও শিল্প দপ্তর) (৪) সর্দ্দার বলদেব সিং (দেশরক্ষা দপ্তর) (৫) ডক্টর জন মাথাই (চলাচল ও রেলওয়ে দপ্তর) (৬) শ্রীযুক্ত জগজীবন রাম (শ্রম সম্পর্কীয় দপ্তর), (৭) মিঃ সি এইচ ভাবা (বহির্বাণিজ্য-দপ্তর), (৮) জনাব রফি আহম্মদ কিদোয়াই (যোগাযোগ-ব্যবস্থা-দপ্তর), (৯) রাজকুমারী অমৃত কাউর (স্বাস্থ্য দপ্তর), (১০) ডক্টর বি আর আম্বেদকর (আইন দপ্তর) (১১) শ্রীযুক্ত ষন্মুখম চেট্টি (অর্থ বণ্টন দপ্তর), (১২) ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (ব্যবসা বাণিজ্য ও সরবরাহ দপ্তর), (১৩) ডক্টর এন্ ভি গ্যাড্‌গিল (খনি, কারখানা ও বিদ্যুৎ সরবরাহ দপ্তর) (১৪) শ্রীযুক্ত কে সি নিয়োগী (আর্ত্তত্রাণ বা বাস্তহারাদের পুনর্বসতি দপ্তর), (১৫) গোপালস্বামী আয়েঙ্গার (দপ্তরহীন মন্ত্রী)। উপরোক্ত মন্ত্রীদের মাসিক বেতন ধার্য্য হলো—৫৫০০৲ টাকা।

এছাড়া ভারত ডোমিনিয়নের রাষ্ট্রপাল গভর্ণর জেনারল রূপে থাকলেন ভূতপূর্ব ভাইসরয় লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন। পরে ঐ মন্ত্রিসভার দু'জন মন্ত্রী স্যার ষন্মুখম চেট্টী ও মিঃ ভাবা পদত্যাগ করেন এবং এর পর মিঃ আর, আর, দিবাকর (দেশীয় রাজ্যদপ্তর) ও মিঃ কে শান্তনম (যানবাহন দপ্তর) ভারপ্রাপ্ত সহযোগী মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

পাকিস্তান ডোমিনিয়নের বিধান পরিষদের প্রথম সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী, ভিন্ন ভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কে কে হলেন?

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ায় পাকিস্তান ডোমিনিয়নের বিধানপরিষদের প্রথম সভাপতি ও গভর্ণর জেনারেল নির্ব্বাচিত হলেন কায়েদে আজম জিন্না সাহেব। পাকিস্তানের প্রথম প্রধান-মন্ত্রী হলেন—জনাব লিয়াকৎ আলি খাঁ; তিনি নিজে দেশরক্ষার ভার নিলেন। অন্যান্য মন্ত্রী হিসাবে ভার নিলেন (২) সর্দ্দার আব্দুর রব নিশ্‌তার (যোগাযোগ

দপ্তর) (৩) জনাব গজনফর আলি (আশ্রয়প্রার্থী ও পুনর্বসতি দপ্তর) (৪) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (আইন ও শৃঙ্খলা দপ্তর) (৫) পীরজাদা আব্দুস সাত্তার (খাদ্য স্বাস্থ্য ও কৃষি দপ্তর) (৬) মহম্মদ জাফরুল্লা খান (বৈদেশিক দপ্তর) (৭) জনাব গোলাম মোহম্মদ (অর্থ-সচিব) (৮) জনাব আই আই চুন্দ্রীগড় (ব্যবসা-বাণিজ্য ও কলকারখানা সংক্রান্ত দপ্তর) (৯) জনাব ফজলুর রহমান (আভ্যন্তরীণ শিক্ষা ও সংবাদ দপ্তর) এঁদের মধ্যে জনাব চুন্দ্রীগড় ও গজনফর আলি মন্ত্রিসভা থেকে অপসারিত হয়েছেন। এবং জনাব খাজা সাহাবুদ্দীন ও ফজলুর রহমান পাকিস্তান মন্ত্রিসভায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছেন। পাকিস্তান ডোমিনিয়নের কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীদের মাসিক বেতন—৩০০০৲ টাকা।

ভারত ও পাকিস্তান কি ভাবে বিভক্ত হলো ?

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা-বিধান (India Independence Act) আইন অনুসারে **ভারত ডোমিনিয়ন গঠিত হলো**—পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বেরার, পূর্ব্বপাঞ্জাব, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, কুর্গ, আজমীর-মারওয়াড়, ত্রিপুরা এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে।

পাকিস্তান গঠিত হলো—পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ, বৃটিশ বেলুচিস্থান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট—ভারত ডোমিনিয়ন ও পাকিস্তান এই ভাবেই গঠিত হলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাব প্রদেশকে দুই ভাগে ভাগ করার জন্য বাউণ্ডারী কমিশন বা "বাঁটোয়ারা পরিষদ" নিযুক্ত করা হলো—দুই ডোমিনিয়নের আইনজ্ঞ প্রতিনিধিদের নিয়ে। বিচারপতি স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফকে এই কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত করলেন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট।

বাঁটোয়ারা পরিষদ বাঙলা ও পাঞ্জাবকে কি ভাবে ভাগ করেছেন ?

১৯৪১ সালের লোকগণনার হিসাব অনুসারে মোটামুটি ভাবে এই দুই প্রদেশের একলপ্তে যে সব জায়গায় মুসলমানরা সংখ্যায় বেশী—সেই সমস্ত

জায়গাকে পাকিস্তানের অধীন করা হয়েছে ও যে সব জায়গায় হিন্দুরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ, সেগুলিকে ভারত ডোমিনিয়ন ভুক্ত করা হয়েছে। এইভাবে বণ্টন করার ফলে পাকিস্তানের অধীন পূর্ব্ব বাঙলা পেয়েছে—খুলনা, যশোরের কিছু অংশ, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, ঢাকা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রংপুর, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, নদীয়া জেলার কিছু অংশ, পাবনা, বগুড়া, রাজসাহী এবং মালদহ ও দিনাজপুরের কিছু অংশ। পূর্ববঙ্গের ভাগে পড়ে মোট ৫১ হাজার বর্গমাইল জমি।

ভারত ডোমিনিয়ন ভুক্ত পশ্চিম বাংলা পায়—দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দিনাজপুর ও মালদহের কিছু অংশ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্দ্ধমান ও নদীয়ার কিছু অংশ, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, কলিকাতা, ২৪ পরগণা ও যশোর জেলার বনগাঁ অংশটি। পশ্চিম বাঙলার ভাগে পড়ে মোট—২৫ হাজার বর্গ মাইল জমি। (১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর রাজ্যপুনর্গঠন ব্যবস্থা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ আরও ৮২৭৯ বর্গমাইল পেয়েছে।)

পূর্ব্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিম পাঞ্জাব কি ভাবে বিভক্ত হয়েছে?

পাকিস্তান ডোমিনিয়নভুক্ত পশ্চিম পাঞ্জাব পায়—রাওয়ালপিণ্ডি, ঝিলাম, গিয়ান ওয়ালী, শাহাপুর, ঝাঙ্গ, গুজরাট, শিয়ালকোট, গুরুদাসপুর জেলার কিছু অংশ, শেখুপুরা, লাহোর জেলার কিছু অংশ, লায়ালপুর, মণ্টগোমারী, মূলতান, মুজাফরগড়, ডেরা গাজী ইস্‌মাইল। পশ্চিম পাঞ্জাবের ভাগে পড়েছে ৬২ হাজার বর্গমাইল জমি।

ভারত ডোমিনিয়নভুক্ত পূর্ব্ব-পাঞ্জাব পায়—গুরুদাসপুরের কিছু অংশ ও লাহোর জেলার অমৃতসর অংশ, জলন্ধর, হোসিয়ারপুর, ফিরোজপুর, লুধিয়ানা, হিসার, রোহতক, গুরগাঁও, কুর্ণাল, আম্বালা, কাঙড়া ও বিয়াস্ জেলা। পূর্ব্ব পাঞ্জাবের ভাগে পড়ে ৩৭ হাজার বর্গ মাইল জমি।

বিভক্ত ভারতবর্ষে—ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে দেশীয় রাজ্য ও রাজাদের সম্পর্ক কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়েছে ?

পূর্ব্বের বৃটিশশাসিত ভারতবর্ষে—ভারতের মধ্যে ছোট বড় অসংখ্য সামন্ত রাজ্য, মিত্ররাজ্য ও করদরাজ্যকে বৃটিশ অভিভাবকত্বের অধীনে রেখে ভারতবর্ষের জাতীয় শক্তিকে সংহত করতে দেওয়া হয় নি। কিন্তু ভারত রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পর—সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও অন্যান্য ভারতীয় নেতারা এই সব ছোট বড় রাজ্যগুলিকেও ভারত রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধিকল্পে বিনা সংঘর্ষে অদ্ভুত উপায়ে সংহত করেছেন—এবং ঐ সমস্ত রাজ্যের সামন্ত ও রাজাদের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক যাতে গণতান্ত্রিক উপায়ে যথেষ্ট হৃদ্যতার সঙ্গে রক্ষিত হয়—তার নানা উপায় উদ্ভাবন ক'রে—স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে একটি বড় সমস্যার সমাধান করেছেন। ভারতবর্ষের ছোট বড় নানা স্টেট ও রাজ্য নূতন ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে তিনটি উপায়ে যুক্ত হয়েছে। প্রথমতঃ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সংলগ্ন বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট স্টেট বা রাজ্যগুলি তাদের নিজ নিজ পছন্দমত সংলগ্ন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হতে স্বীকৃত হয়েছে। এই ভাবে এ পর্য্যন্ত– ২৩টি স্টেট উড়িষ্যা প্রদেশের সঙ্গে, ১৫টি স্টেট মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের সঙ্গে, ২টি স্টেট বিহার প্রদেশের সঙ্গে, ২টি স্টেট মাদ্রাজ প্রদেশের সঙ্গে, ৩টি স্টেট পূর্ব্ব পাঞ্জাবের সঙ্গে এবং ১৭৪টি স্টেট বোম্বাই প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। যার ফলে ঐ প্রদেশগুলির আয়তন, লোক-সংখ্যা ও রাজস্বের পরিমাণও বেড়ে গেছে। দ্বিতীয় উপায়ে যে ভাবে কয়েকটি রাজ্য ভারত ডোমিনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তা হচ্ছে—সেগুলি পরস্পর মিলিত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এই ভাবে ২১টি স্টেট মিলিত হয়ে গঠিত হয়েছে হিমাচল প্রদেশ এবং কচ্ছ স্টেট একাই এই ভাবে ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হতে স্বীকৃত হয়। এ ছাড়া যেগুলি অপেক্ষাকৃত বড় রাজ্য ও একটি অপরটির সংলগ্ন—সেই সমস্ত স্টেট খণ্ড খণ্ড ভাবে বিচ্ছিন্ন না থেকে অখণ্ড আকার গ্রহণ করে ভারত ডোমিনিয়নের

অন্তর্ভুক্ত স্বায়ত্ত-শাসিত নূতন প্রদেশরূপে পরিগণিত হতে চায়। এই ভাবে সৌরাষ্ট্র প্রদেশ গঠিত হলো ২১৭টি স্টেট নিয়ে, মধ্য প্রদেশ গঠিত হলো ৪টি স্টেট নিয়ে, বিন্ধ্যপ্রদেশ গঠিত হলো ৩৫টি স্টেট নিয়ে, রাজস্থান প্রদেশ গঠিত হলো ১০টি স্টেট দিয়ে, মধ্যভারত প্রদেশ গঠিত হলো ২০টি স্টেট নিয়ে, পাতিয়ালা ও পূর্ব্ব পাঞ্জাবপ্রদেশ গঠিত হলো ৮টি স্টেট নিয়ে। যে সমস্ত স্টেট ভারত ডোমিনিয়নের সঙ্গে স্বেচ্ছায় যুক্ত হয়েছে, তার মধ্যে ভূপাল, জাঞ্জিরা, পালনপুর, আচিন, ক্যাম্বে, মালেরকোটলা, রামপুর ও টঙ্ক প্রভৃতি মুসলিম স্টেটও আছে। হায়দ্রাবাদ ও জুনাগড় রাজ্যও ভারত রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কাশ্মীরও ভারতরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় সহযোগিতা করে চলেছে। বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্টেটই যেমন ভারত রাষ্ট্রভুক্ত হয়েছে বা হতে চলেছে, তেমনই কয়েকটি স্টেট পাকিস্তান ডোমিনিয়নের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছে।

পাকিস্তান ডোমিনিয়নের সঙ্গে বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ দেশীয় রাজ্য যোগ দিয়েছে?

ভাওয়ালপুর, খয়েরপুর, দির, সওয়াত, চিত্রল, ঘারান, লাবেলা, মাক্রাম ও কালাত্ এই নয়টি স্টেট পাকিস্তান ডোমিনিয়নে যোগ দিয়েছে।

সাধারণতন্ত্র ভারত কত বড় দেশ?

ভারতবর্ষ যে কত বড় দেশ, তা ভূগোলের বিবরণ ও ম্যাপের বই দেখে সহজে বোঝা সম্ভব নয়। যদি এর বিরাটত্ব বর্ণনা করতে হয়, তাহলে বলতে পারা যায় পাকিস্তান হওয়ার পরেও ভারতের আয়তন হচ্ছে ১২ লক্ষ ৬৯ হাজার ৬৪০ বর্গ মাইল। রুশিয়াকে বাদ দিলে ইউরোপের বাকী অংশটাই ভারতের সমান বা গোটা আমেরিকার অর্দ্ধেকের মতো এই ভারতবর্ষ। মোটামুটি জেনে রাখো, মাদ্রাজ, রাজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার প্রভৃতি প্রদেশের প্রত্যেকটিই বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের চেয়ে আকারে বড়। ইতালি দেশ হলে কি হবে ভারতবর্ষের আগ্রা, অযোধ্যা প্রদেশ ও বিহার উড়িষ্যা প্রদেশের চেয়ে আকারে ঢের ছোট।

হায়দ্রাবাদ রাজ্য ও কাশ্মীর রাজ্যটা গোটা গ্রেটবৃটেনের সমান। ভেবে দেখ তো এত বড় বিরাট দেশে বাস করেও আজও ভারতবাসী কি অবস্থায় রয়েছে? শুধু কি তাই! লোক সংখ্যার দিক থেকে গোটা পৃথিবীতে যত লোক বাস করে, তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ লোক আছে এই ভারতে। রুশিয়া বাদে গোটা ইউরোপে যত লোক আছে, প্রায় তত লোক আছে আমাদের এই ভারতবর্ষে। ফ্রান্সে যত লোক বাস করে, ততলোক বাস করে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ। পাঞ্জাবের সঙ্গে স্পেন পর্ত্তুগালের, আসামের সঙ্গে বেলজিয়ামের তুলনা করা চলে।

ভারতবর্ষে কতগুলি ভাষা প্রচলিত আছে?

ভারতবর্ষে ২২৫টি উল্লেখযোগ্য ভাষা প্রচলিত আছে তার মধ্যে হিন্দী, বাঙলা, মারাঠী, তামিল, তেলেগু, গুজরাটী ও পাঞ্জাবী ওড়িয়া ও অসমীয়া ভাষাই প্রধান। হিন্দী ভাষা কয়েক রকমের ব্যবহৃত হয়—তার মধ্যে বিহারী-হিন্দীতে কথা বলে—২ কোটি ৭৯ লক্ষ লোক; পশ্চিমা হিন্দীতে কথা বলে ৭ কোটি লোক, পূর্ব্বীয় হিন্দীতে কথা বলে ৭৮ লক্ষ লোক। বর্ত্তমানে এই ভাষাতেই বেশীর ভাগ লোক কথা বলে—তাই ওটিকেই রাষ্ট্র ভাষা করবার ব্যবস্থা হয়েছে। বাঙলা দেশে শতকরা ৯২ জন লোক এবং মোট ৬ কোটি লোক বাঙলা ভাষায় কথা বলে। বর্ত্তমানে বাংলা ভাষী ৩ কোটি লোক পাকিস্তান রাষ্ট্রের অধিবাসী হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের উত্তর অঞ্চলের লোক হিন্দী ভাষায় কথা বলে; কিন্তু পশ্চিম অঞ্চল ও বেরারের লোক মারাঠী ভাষায় কথা বলে। মাদ্রাজের দক্ষিণ অংশের লোকেরা তামিল ভাষায় ও উত্তর অংশের অধিকাংশ লোকেই তেলেগু ভাষায় কথা বলে। কেরালা প্রদেশ, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন ও মালাবারে 'মালয়ালম' ভাষায় লোক কথাবলে। বোম্বাই প্রদেশে প্রধানতঃ গুজরাটী, মারাঠী ও কর্ণাটী এই তিন ভাষাতেই লোকে কথাবার্ত্তা বলে। আসামে অধিকাংশ লোকেই বাংলা ভাষায় কথা বলে তবে সেখানে 'অহমীয়া' বা অসমীয়া এবং লুসাই ও গারো ভাষাও চলে, এছাড়া

পাহাড়ী ভাষার চল আছে হিমালয়ের নিম্ন উপত্যকায়। কঙ্কন ভাষায় কথা বলে ভারতের পশ্চিম উপকূলের বাসিন্দারা, এটা অনেকটা মারাঠীর মতই।

ভারতবর্ষের সম্পদ বলতে কি কি বোঝায়?

ফলমূল শস্য, উদ্ভিজ উপাদান, বনজ গাছপালা, খনিজ পদার্থ ও জন্তু-জানোয়ারকেই দেশের সম্পদ বলা হয়। এ সমস্ত সম্পদের প্রাচুর্য্যে আমাদের ভারতবর্ষের সমান দেশ জগতে আর কোথাও মেলে না—কারণ, এই ভারতবর্ষের উর্ব্বরা মাটিতে অল্প পরিশ্রমেই ধান, গম, বার্লি, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা প্রভৃতি শস্য, ছোলা, মটর, অড়হর প্রভৃতি ডাল ও ঐ জাতের পুষ্টিকর খাদ্যসম্ভার প্রচুর জন্মায়। গোটা পৃথিবীতে ধান, গম, পাট ও তূলা মোট যা জন্মায় তার তিন ভাগের এক ভাগ জন্মায় এই ভারতবর্ষে। সবজীর মধ্যে কুমড়ো, বেগুন, লাউ, সিম, ঢ্যাড়স্, রাঙা-আলু প্রভৃতি জিনিস এদেশের নিজস্ব জিনিস, ফলের মধ্যে আম, কলা, পেয়ারা, ডালিম, কাঁঠাল, শশা, তরমুজ, ফুটি, কমলালেবু প্রভৃতি—এগুলো ভারতের নিজস্ব ফল, এদেশে এ সব ফল যত ভাল ফলে অন্য কোথাও সেভাবে ফলে না। তাছাড়া কাশ্মীরেও ইউরোপীয় ফলের চাষ হয়েছে এবং সেখানে প্রচুর জন্মায় সেগুলি। এদেশের আখ, খেজুর ও তাল থেকে প্রচুর চিনি মিছরি পাওয়া যায়। কারণ পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষেই সবচেয়ে বেশী আখ জন্মায়। মশলাপাতির মধ্যে হলুদ, লঙ্কা, আদা, গোলমরিচ, ধনে, জিরে প্রভৃতি প্রচুর চাষ হয় এদেশে; এবং এদেশ থেকে বহু মশলা বিদেশে চালান যায়। মহীশূর, কুর্গ, ত্রিবাঙ্কুর ও নীলগিরিতে প্রচুর পরিমাণে কফি পাওয়া যায়। এই কফিও বহু পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হয়। ভারতবর্ষের মধ্যে আসাম, কাঙড়া উপত্যকা ও নীলগিরিতে এত 'চা' জন্মায় যে পৃথিবীর চাষের বাজারে ভারতই এখন সবচেয়ে বেশী চা যোগায়।

জন্তু জানোয়ারের চামড়া, হাড়, শিং ও খুর আজকাল নানান কাজে লাগে এবং তার বিনিময়ে যথেষ্ট আয়ও হয়—কাজেই জন্তু-জানোয়ারকেও দেশের

সম্পদ বলে ধরা হয়। ভারতবর্ষ কাঁচা চামড়ার রপ্তানী-বাণিজ্যে পৃথিবীর বাজারে সবার ওপরে। এছাড়া ভারতবর্ষে হিমালয় পর্ব্বতের উপত্যকায় প্রায় সব জাতের সবরকম জন্তুই পাওয়া যায়—ভারতের গণ্ডার, হাতী, বাঘ (রয়েল বেঙ্গল টাইগার), ভাল্লুক, কুমীর এ সব জানোয়ার যায় বিভিন্ন দেশের চিড়িয়াখানায়, সে জন্যে খুব দামেও বিক্রী হয় সেগুলো। পৃথিবীতে মোট যত গরু, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া প্রভৃতি গবাদি পশু জন্মায়—তার তিনভাগের একভাগ জন্মায় এই ভারতবর্ষে।

খনিজ পদার্থ যা ভারতবর্ষে পাওয়া যায় তার মধ্যে কয়লাই হলো সবচেয়ে বিশিষ্ট মূল্যবান সম্পদ—কয়লার পরেই 'ম্যাঙ্গানিজ', তারপর 'অভ্র', তাছাড়া 'লোহা' এবং 'তামা'ও বড় সম্পদ। এগুলি ছাড়া ইলিমেনাইট, ম্যাগ্‌নেসাইট, মোনাজাইট ও জিরকন (zircon) সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র এই ভারতবর্ষ। ভারতের এই বিশিষ্ট সম্পদগুলির পরিমাণ অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী। এদেশে সোনাও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, তবে ভারতে যত সোনা উৎপন্ন হয়—মহীশূরের অন্তর্গত কোলারের সোনার খনিতেই হাজার করা তার ৯৫৪ ভাগ পাওয়া যায়। প্রতিবছর এদেশে গড়ে ৩ লক্ষ আউন্স সোনা পাওয়া যায়। পৃথিবীতে মোট যত 'অভ্র' পাওয়া যায়, ভারতবর্ষেই তার শতকরা ৮৭ ভাগ পাওয়া যায়। এসব ছাড়া ছোটনাগপুরে ও সিংভূম জেলায় ক্রোমিয়াম, টাংস্টেন, ওল্‌ফ্রাম প্রভৃতি ধাতু পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারত, রাজপুতানা, নেপাল, সিকিম ও ভূটানে কিছু কিছু তামাও পাওয়া গেছে। এই সব ধাতুই ভারতের সবচেয়ে মূল্যবান ঐশ্বর্য্য, কিন্তু এই ব্যবসাগুলির সমস্তই এতদিন ছিল বিদেশীদের হাতে। আসাম ও পাঞ্জাবের খনি থেকে পেট্রোলিয়াম ও কেরোসিন পাওয়া যায়, তবে তার লাভের বেশীটাই নিতো বিদেশীরা। ভারত স্বাধীন হওয়ায় এ ব্যবসাগুলি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার ব্যবস্থা হয়েছে। উত্তরপশ্চিম সীমান্ত ও পাঞ্জাবে লবণের খনি আছে—এ ছাড়া ভারতের নানা জায়গায় সমুদ্রের জল শুকিয়ে

মার্চ মাস পর্যন্ত ৯৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ হয়েছে এবং ১৮৩০০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়েছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে শিল্প-উৎপাদন কতখানি বেড়েছে?

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর থেকেই শিল্প বাণিজ্যের উৎপাদন নানাদিক থেকে নানাভাবে বাড়িয়ে তোলার প্রয়োজন হয়। কারণ বিদেশী জিনিষ কিনে দেশের টাকা বিদেশে পাঠিয়ে দেশের উন্নতি করা যায় না। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষ তাই শিল্প-বিপ্লবের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাও এ বিপ্লবকে অনেকখানি শক্তি জুগিয়ে দেয়, যার ফলে ১৯৪৯ সালে শিল্প-উৎপাদনের মান ১০০ ধরলে ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে ১৬২·৯। ১৯৫৪-৫৫ সালের শিল্প-উৎপাদনের হিসাবে দেখা যায় যে ১২লক্ষ ৪৩ হাজার টন ইস্পাত, ৫ হাজার ৪ শত ৭৬ টন অ্যালমুনিয়াম, ৪৪লক্ষ ১৪ হাজার টন সিমেণ্ট, ৫ শত ৪ কোটি ৬০ লক্ষ গজ সূতীবস্ত্র উৎপন্ন হয়েছে। ১৯৫৪-৫৫ সালে বাই-সাইকেল তৈরী হয়েছে ৫ লক্ষ ৩০ হাজারটি, যা ছিল ১৯৫০-৫১ সালে ১ লক্ষ ১ হাজার। রেলের ইঞ্জিন ও ওয়াগন তৈরীর কাজও আরম্ভ হয়েছে। চিত্তরঞ্জন কারখানায় ১৯৫৩-৫৪ সালে ৬৪টি ইঞ্জিন তৈরী হয়। সে জায়গায় ১৯৫৪-৫৫ সালে হয়েছে ৮৬টি। ১৯৫০-৫১ সালে ৩৩ হাজারটি সেলাই কলের জায়গায় ১৯৫৪-৫৫ সালে ৭৯ হাজারটি সেলাই কল তৈরী হয়েছে। এছাড়া সিন্ধ্রীর সার উৎপাদনের কারখানায় এ্যালুমিনিয়াম সালফেটের উৎপাদন ৪৬ হাজার টন থেকে ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার টনে পৌছেছে। সিন্ধ্রিতে সার উৎপাদনের কারখানা, ভারতীয় টেলিফোন তৈরীর কারখানা, আলীপুর নতুন টাকশাল, হিন্দুস্থান কেবলস্‌, এবং ছোট যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানা বহু গড়ে উঠেছে। ভারতের গৌরব টাটার কারখানা ছাড়াও আরও ৩টি বড় বড় ইস্পাতের কারখানা গড়ে তোলার কাজ আরম্ভ হয়েছে। বোম্বাইয়ের অন্তর্গত 'ট্রোম্বে'তে পেট্রল শোধনাগার বিরাটভাবে গড়ে তোলা হয়েছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কি কি উন্নতি হয়েছে ?

যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য ভারতীয় রেলপথেরও পাঁচ বছরের একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয় এবং প্রথম ৩ বছরেই পরিকল্পনার লক্ষ্যের অর্দ্ধেকটাই করে ফেলা সম্ভব হয়েছে। ১৩৫৬ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত ৭০৩ মাইল নতুন রেলপথ বসানো হয়েছে এবং ৩৬০·৩৫ মাইল পুরানো রেলপথের সংস্কার করা হয়েছে। প্রথম ৪ বছরেই ৩০৩৯টি রেলের কোচ, ২৭৬৬৬টি ওয়াগন এবং ৩২০টি ইঞ্জিন তৈরী করা হয়েছে। বিশাখাপত্তনে হিন্দুস্থান জাহাজ কারখানায় ১৩টি সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরী হয়েছে। একাধিক জাতীয় পথ, ৪৪০টি রাজপথ ও ২৫টি বড় বড় সেতু নানান জায়গায় গড়ে তোলা হয়েছে। ২৭টি বেতার-কেন্দ্রে কাজ চালু হয়েছে এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ৫টি বছরে প্রায় ১ লক্ষ অতিরিক্ত টেলিফোন লাইন বসানো হয়েছে এবং পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের সঙ্গে সরাসরি টেলিফোনে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা-বিস্তারের কি ভাবে উন্নতি ঘটেছে ?

১৯৫৫ সালের মার্চ মাসের ভেতরেই ২০ হাজারটি নতুন বিদ্যালয় এবং ৫৭০০টি নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষায়তন খোলা হয়েছে এবং ২ কোটি ৩৬ লক্ষ ছেলে-মেয়ে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে। বয়স্কদের শিক্ষিত করে তোলার কাজও বেশ ভালভাবেই এগিয়ে চলেছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী বলতে কি বোঝায় ?

ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা জনগণের সহায়তায় জনসাধারণের কল্যাণের জন্যই সাফল্যলাভ করেছে। সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে পরিকল্পনা কমিশন ৭১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৫৬-১৯৬১) ভিত্তি রচিত করেছেন। সরকার এবারকার নতুন পরিকল্পনায় মূলতঃ

লবণ তৈরী করা হয়। এদেশের লোকের যত লবণ খরচ হয়, তার মধ্যে ৯৪ ভাগ এদেশেই পাওয়া যায়।

উদ্ভিজ উপাদান বলতে বুঝে নিও, গাছপালা থেকে আমরা দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্যে যে সমস্ত দরকারী জিনিস পাই, যেমন ধরো—পাট, তুলা, নানারকম তেলের বীজ, আফিম, নীল, তামাক, সিন্‌কোনা (কুইনাইন), সিল্ক, রবার, খয়ের প্রভৃতি। ভারতের তুলাও বড় কম সম্পদ নয় –তুলার উৎপাদনে ভারতবর্ষ জগতের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। তারপর হলো ভারতবর্ষের সবচেয়ে দামী সম্পদ 'পাট'। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান ছাড়া জগতের আর কোনও দেশে পাট জন্মায় না।

ভারতবর্ষের জঙ্গলে যে সমস্ত গাছপালা আপনা থেকেই জন্মায়, তারও দাম বড় কম নয়। ভারতের শাল ও সেগুনের মত মজবুত কাঠ অন্য কোনও দেশে বিশেষ পাওয়া যায় না, ভাল ভাল আসবাব পত্র তৈরীর কাজে এসব কাঠের দরকার হয় তা তোমরা জানো। তাছাড়া ভারতের চন্দন, মেহগ্নি, আবলুস কাঠ, তারও আদর সব দেশেই আছে। জঙ্গলের গাছপালা থেকে কাঠ ছাড়াও আরও নানারকমের জিনিসও পাওয়া যায়। তারপিন তেল, রজন, ধুনা এই সমস্ত জিনিসও ভারতের জঙ্গলের বিভিন্ন জাতের গাছ থেকেই পাওয়া যায়। ভারতের নারিকেল আর তাল সুপারি গাছও যে কতবড় আয়ের জিনিস তা সকলেই জানো আশা করি। এসব ছাড়া নানারকম মণিরত্নের জন্য ভারতবর্ষ প্রসিদ্ধ। পদ্মরাগ, নীলকান্ত, গোমেদ ও অন্যান্য শ্রেণীর মণি পাওয়া যায়—কাশ্মীর, ছোটনাগপুর, রাজপুতানা, অনন্তপুর, কুরনুল, গুণ্টুর জেলায়, কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর আশপাশের জেলাগুলিতে, সম্বলপুর ও মধ্যভারতের পান্না রাজ্যে হীরকও পাওয়া যায়। ভারতের এত রকম সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আজ ভারতবাসীরা দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না। এর কারণ, আমরা ভারতবাসীরা আমাদের নিজের দেশের সমস্ত সম্পদগুলিকে চিনি না, বা তার সদ্ব্যবহার জানি না ও সেগুলিকে রক্ষা করার চেষ্টা করি না।

শিল্প-প্রচেষ্টা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ভিতর দিয়ে এই সম্পদগুলির দাম বাড়িয়ে আমরা দেশকে যে কত সমৃদ্ধিশালী করতে পারি, সে কথাও আমরা ভাবতে শিখিনি।

ভারতবর্ষের শিল্পবাণিজ্য কি ভাবে বাড়ছে ?

ভারতের শিল্পপ্রচেষ্টাকে দু'ভাগে ভাগ করা চলে, এক হচ্ছে 'কুটীর-শিল্প' আর এক হচ্ছে সমবেত প্রচেষ্টায় সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই দু'টি দিক থেকেই পরাধীন ভারতবর্ষ অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক পিছনে পড়েছিল। স্বাধীন হওয়ার পর প্রজাতন্ত্র ভারতে শিল্পবাণিজ্য এত তাড়াতাড়ি বেড়ে চলছে, যা ভাবা যায় না।

কুটীর-শিল্প বলতে—সব আগেই আসে ভারতের তাঁত-শিল্পের কথা—ভারতের তাঁত-শিল্পের খ্যাতি একদিন সারা জগতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এখানকার তাঁতে-বোনা মসলিন কাপড় সেকালে গোটা ইউরোপে চালান যেত, তার সূক্ষ্মতা ও শিল্পকাজ দেখে সারা জগত বিস্ময়ে অবাক হয়ে থাকতো। কিন্তু এই তাঁত-শিল্প বিদেশী কাপড় ও মিলের প্রতিযোগিতায় একেবারে মরে গেছলো বললেই চলে—তাঁতীরা পেটভরে খেতে পেতো না কিছুদিন আগেও। কিন্তু সরকারী সাহায্যে তাঁত-শিল্প সংরক্ষণ ব্যবস্থায়—তাঁতীদের অবস্থা ফিরেছে। এছাড়া ভারতের নানা সূক্ষ্মশিল্প—যেমন কাঠ-খোদাই, হাতীর দাঁতের কাজ, মূর্ত্তি ও পুতুল-গড়া, বাসন তৈরীর কাজ প্রভৃতি সব কুটীর-শিল্পই নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল শিল্পী ও ক্রেতার অভাবে। দেশের লোকেরা সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার কোনও চেষ্টাই করতো না। বিদেশী ছবি, বিদেশী খেলনা, বিদেশী হাঁড়ি-কুড়ি, বাসন-কোসন ঘরে সাজানো যে, দেশের পক্ষে কত লজ্জাজনক ও ক্ষতিকর তাও কেউ বোঝে না। কুটীর-শিল্পের উন্নতির দিক থেকে তাই ভারতবর্ষের কোন গৌরবই তেমন করে বাড়েনি, ঠিক যতটা বাড়া উচিত ছিল। কুটীর-শিল্পের উন্নতি কি ভাবে হতে পারে সেই সব বিষয়ে গবেষণা, অনুসন্ধান ও পরিচালনা করার জন্য স্বাধীন-

ভারতে 'কটেজ ইণ্ডাস্ট্রিজ বোর্ড' গঠিত হয়েছে। প্রদর্শনী ও প্রচারের সাহায্যে কুটির-শিল্পের আদর, উৎপাদন বাড়ানো হচ্ছে।

ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কল-কারখানা গড়ার দিকে ভারত সরকার দৃষ্টি দিয়েছেন কিন্তু দেশের ধনীরা টাকা প্রয়োগ না করায় এবং শ্রমিকরা অনবরত ধর্ম্মঘট করায় বড় ক্ষতি হচ্ছে। তা সত্ত্বেও প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সত্যিই অনেক উন্নতি হয়েছে। ১৯৪৯ সালের শিল্প-বাণিজ্যের সূচীকে যদি ১০০ ধরা হয়, ১৯৫৫ সালে হয়েছে ১৬২·৯। ইংরেজ-আমলে এদেশে কাপড়ের কল, পাটের কল ও চিনির কল, বনস্পতির কারখানা খুব বেশী পরিমাণে গড়ে উঠেছিল। এ দেশের সবচেয়ে বড় কল-কারখানার ব্যাপার বলতে কাপড়ের কলগুলিকেই বোঝাতো। টাটা কোম্পানীর লোহার কারখানা ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বড় কারখানা এবং এটিকেই ভারতীয়দের সবচেয়ে গৌরবজনক শিল্প-প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। এছাড়া চামড়া ট্যান করার কারখানা, চিনির কল, পশমী কাপড় তৈরীর কারখানা, প্রভৃতি বহু ছোট বড় কারখানা গড়ে উঠেছে এদেশে। সম্প্রতি এদেশে রকমারী যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র এবং মোটরগাড়ী, বিমান ও জাহাজ-তৈরীর বড় বড় কারখানা গড়ে তোলা হয়েছে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান রাজ্যগুলির আয়তন ও লোকসংখ্যা কত ?

১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর ভারত প্রজাতন্ত্রের রাজ্য-পুনর্গঠন ব্যবস্থা অনুযায়ী কতকগুলি ছোট বড় প্রদেশ ও রাজ্যের নাম ও এলাকা পরিবর্তিত হয়ে পরের পৃষ্ঠায় উল্লিখিত রাজ্যগুলিকে নিয়ে ভারতবর্ষ গঠিত করা হয়েছে।

প্রদেশ	আয়তন		লোকসংখ্যা (১৯৫৬)
পশ্চিমবঙ্গ	৩৩,২৭৯	বর্গমাইল	২ কোটি ৬১ লক্ষ
আসাম	৮৪,৯২৪	"	৯০ লক্ষ
মাদ্রাজ	৫০,১৭০	"	৩ কোটি
উত্তরপ্রদেশ	১১৩,৪১০	"	৬ কোটি ৩২ লক্ষ
বিহার	৮৭,৮৩০	"	৩ কোটি ৯০ লক্ষ
মধ্যপ্রদেশ	১৭১,২০০	"	২ কোটি ৬১ লক্ষ
পাঞ্জাব	৪৬,৬১৬	"	১ কোটি ৬০ লক্ষ
বোম্বাই	১৮৮,২৪০	"	৪ কোটি ৭৮ লক্ষ
উড়িষ্যা	৬০,১৪০	"	১ কোটি ৪৬ লক্ষ
অন্ধ্র	১১০,২৫০	"	৩ কোটি ২২ লক্ষ
কাশ্মীর ও জম্মু	৯২,৭৮০	"	৪৪ লক্ষ
কেরালা	১৪,৯৮০	"	১ কোটি ৩৬ লক্ষ
মহীশূর	৭২,৭৩০	"	১ কোটি ৯০ লক্ষ
রাজস্থান	১৩২,৩০০	"	১ কোটি ৬০ লক্ষ

এই পনেরোটি রাজ্য ছাড়া সাতটি কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চলও ভারতে আছে।

ভারতবর্ষের বর্তমান ছোট বড় বন্দর কি কি?

ভারতবর্ষের সমুদ্রের উপকূলে যে সব ছোট বড় বন্দর আছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কান্দলা, ডিউ, সুরাট, দমন, বোম্বাই, মর্মুগাও, বেদী, ওখা, ভাবনগর, ম্যাঙ্গালোর, কালিকট, কোচিন, তালেজ্জী কুইলন, তুতিকোরিন, ত্রিবান্দ্রাম, কারিকল, পণ্ডিচেরী, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তন, মসলিপত্তন, কলিকাতা, কুদালোর, কোকন্দ, এলেপ্পি, ধনুষ্কোটি ও নাগাপট্টম। এই বন্দরগুলির মধ্যে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কোচিন আর বিশাখা-পত্তন বন্দরেই ভারতের বিদেশী বাণিজ্যের ৭ ভাগের ৬ ভাগ কাজ হয়।

মারমাগোয়া, দমন, ডিউ, পর্ত্তুগাল অধিকৃত ভারতের, বাকি সবগুলি ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্গত।

ভারতবর্ষে আমদানী-রপ্তানী-বাণিজ্য কি ভাবে চল্‌ছে?

ভারতবর্ষে গত ১৯৫৫-৫৬ সালে এক বছরে মোট ৬৭৯·৭৬ কোটি টাকার মাল আমদানী হয়েছে। আর ভারতবর্ষ থেকে রপ্তানী করা হয়েছে ৬০৪·৭১ কোটি টাকার মাল। অর্থাৎ প্রায় ৭৫·০৫ কোটি টাকার ঘাটতি পড়েছে।

ভারতের সভাপতি ও মন্ত্রীরা কে কত মাইনে পান?

ভারত ইউনিয়নের সভাপতি মাসে ১০,০০০৲ টাকা বা বছরে ১,২০,০০০৲ টাকা বেতন পান। ভারতের প্রধান মন্ত্রী মাসে ৫০০০৲ টাকা বেতন পান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার মন্ত্রীরা মাসে ৩০০০৲ টাকা বেতন, ৫০০৲ টাকা ভাতা এবং গাড়ী ও বাসভবন পান।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কোথায় ও কবে স্থাপিত হয়?

১। অন্ধ্র (১৯২৬) ২। আগ্রা (১৯২৭) ৩। আলীগড় (১৯২০) ৪। আন্নামালাই (১৯২৯)। ৫। উৎকল (১৯৪৩)। ৬। এলাহাবাদ (১৮৮৭) ৭। ওস্‌মানিয়া (১৯১৮) ৮। কলিকাতা (১৮৫৬) ৯। কর্ণাটক (১৯৫০) ১০। কাশ্মীর (১৯৪৮) ১১। গুজরাট (১৯০৯) ১২। গৌহাটি (১৯৪৮) ১৩। জামিয়া মিলিয়া, দিল্লী (১৯২১) ১৪। দিল্লী (১৯২২) ১৫। নাগপুর (১৯২৩) ১৬। পাটনা (১৯২৭) ১৭। পাঞ্জাব (১৯৪৮) ১৮। পুণা (১৯৪৮) ১৯। বরোদা (১৯৪৯) ২০। বেনারস (১৯১৫) ২১। বোম্বাই (১৮৫৭) ২২। বিশ্বভারতী (১৯৫১) ২৩। ত্রিবাঙ্কুর (১৯৩৬) ২৪। মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনা (১৯১৬) ২৫। মহীশূর (১৯১৬) ২৬। মাদ্রাজ (১৮৫৭) ২৭। মধ্যভারত (১৯৪৮) ২৮। লক্ষ্ণৌ (১৯২০) ২৯। পূর্ব্ব পাঞ্জাব (১৯৪৭) ৩০। যাদবপুর (১৯৫৫)। ৩১। মহারাষ্ট্র (১৯৪৯)।

উপরের কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সব দিক দিয়ে ভারতবর্ষের, এমন কি প্রাচ্যের সব চেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয়।

ভারতবর্ষে মোট কতগুলি গ্রাম আছে?

ভারতবর্ষে মোট ৫৬০০০০ গ্রাম আছে। তার মধ্যে ৩০০০ গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়।

১৮৮৫ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্য্যন্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি কোন্ কোন্ সালে কে হয়েছেন?

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জী—(বোম্বাই ১৮৮৫, এলাহাবাদ ১৮৯২); দাদাভাই নৌরোজি—(কলিকাতা ১৮৮৬, লাহোর ১৮৯৩, কলিকাতা ১৯০৬); স্যার বদরুদ্দিন তায়েবজি—(মাদ্রাজ ১৮৮৭); জর্জ্জ ইয়ুল—(এলাহাবাদ ১৮৮৮); স্যার ডব্লিউ ওয়েড ডারবার্ণ—(বোম্বাই ১৮৮৯, এলাহাবাদ ১৯১০); মিঃ পি, মেটা—(কলিকাতা ১৮৯০); পি, আনন্দচারলু—(নাগপুর ১৮৯১); এ, ওয়েব—(মাদ্রাজ ১৮৯৪); এস, এন, ব্যানার্জ্জী—(পুণা ১৮৯৫, আমেদাবাদ ১৯০২); আর, এম, সিয়ানী—(কলিকাতা ১৮৯৬); সি, শঙ্করন নায়ার—(অমরাবতী ১৮৯৭); আনন্দমোহন বসু—(মাদ্রাজ ১৮৯৮); রমেশচন্দ্র দত্ত—লক্ষ্ণৌ (১৮৯৯); এন, জি, চন্দ্রাবরকর—(লাহোর ১৯০০); দিনসা ওয়াচা—(কলিকাতা ১৯০১); লালমোহন ঘোষ—(মাদ্রাজ ১৯০৩); স্যার হেনরী কটন—(বোম্বাই ১৯০৪); জি, কে, গোখ্‌লে—(বেনারস ১৯০৫); রাসবিহারী ঘোষ—(সুরাট ১৯০৭, মাদ্রাজ ১৯০৮); পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য—(লাহোর ১৯০৯, দিল্লী ১৯১৮); বি, এন, দার—(কলিকাতা ১৯১১); আর এন, মুদলকার—(পাটনা ১৯১২); নবাব সৈয়দ আহম্মদ—(করাচী ১৯১৩); ভূপেন্দ্রনাথ বসু—(মাদ্রাজ ১৯১৪); লর্ড এস, পি, সিংহ—(বোম্বাই ১৯১৫); মতিলাল নেহরু—(অমৃতসর ১৯১৯, কলিকাতা ১৯২৮); সি, বিজয়রাঘব আচারিয়া—(নাগপুর ১৯২০); লালা লাজপত রায়—(কলিকাতা বিশেষ অধিবেশন ১৯২০); হাকিম আজমল খাঁ—(আমেদাবাদ ১৯২১); দেশবন্ধু

শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি, সাধারণ উন্নয়ন ব্যবস্থার জন্য মোট ৪৮০০ কোটি টাকা কাজে লাগাবেন এবং সেই সঙ্গেই জনসাধারণ-এর তহবিল থেকে আরও ২৩০০ কোটি টাকা পরিকল্পনার সহায়তায় কাজে লাগানো হবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আগামী পাঁচ বছরে জাতীয় আয় শতকরা ২৫ ভাগ এবং মাথা পিছু আয় শতকরা ১৮ ভাগ বাড়বে ব'লে আশা করা যেতে পারে। এই পরিকল্পনার ফলে প্রায় ১ কোটি বাড়তি লোককে কাজ দেওয়া সম্ভব হবে। তাই আগামী পাঁচ বছরে কুটির-শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বড় বড় কলকারখানা দেশের দিকে দিকে গড়ে তোলার ব্যবস্থায় হাত দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আকার এবং প্রকারটা কি ধরণের হবে ?

সংক্ষেপে বলা চলে—কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৬ থেকে ১৯৬১ সাল পর্য্যন্ত, এই পাঁচটি বছরে সরকারী তহবিল থেকে মোট ৪৮০০ কোটি টাকা খরচ করবেন। তার মধ্যে সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থায়—ঐ টাকার শতকরা ১৮ ভাগ খরচ করা হবে; জাতীয় সম্প্রসারণ ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা সহ চাষবাসের উন্নতি বাবদে খরচ হবে মোট বরাদ্দের শতকরা ১২ ভাগ টাকা; কল-কারখানা ও খনিজ পদার্থের উৎপাদন ও উন্নতির জন্য শতকরা ১৯ ভাগ এবং যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় শতকরা ২৯ ভাগ টাকার খরচ ধরা হয়েছে। সমাজ-সেবা, গৃহ নির্ম্মাণ ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বাবদ খরচ ধার্য্য হয়েছে পরিকল্পনার মোট খরচের শতকরা ২০ ভাগ টাকা। অবশ্য এই সব খরচের বরাদ্দে প্রয়োজনমতো কিছু অদল-বদল বা বাড়ানো-কমানোর দরকার হতে পারে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেচ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার আরও উন্নতির পথ কি ভাবে করা হয়েছে ?

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এদেশের চাষ-আবাদের ব্যাপারটা কিভাবে কতখানি উন্নতি লাভ করেছে—সেকথা আগেই বলা হয়েছে। দ্বিতীয়

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত হয়েছে যে, আগামী পাঁচ বছরে আরও ২ কোটি ১০ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হবে। বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি হবে, কারণ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজের ফলে ১৯৫৬ সাল পর্য্যন্ত ৩৪ লক্ষ কিলোওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে আগামী পাঁচ বছরে বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন বাড়িয়ে করা হবে সেটিকে ৬৮ লক্ষ কিলোওয়াট।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজ-উন্নয়নের ব্যবস্থাটি কি ভাবে করা হয়েছে?

১৯৫৬-৬১ সালের পরিকল্পনায় সমাজ-উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণের কাজের প্রোগ্রামে ধরা হয়েছে যে, আগামী পাঁচ বছরে সারা ভারতে ৩৮০০টি জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক এবং ১১২০টি সমাজ-উন্নয়ন ব্লক বা গ্রামঘাঁটিতে উন্নয়নের কাজ সম্পূর্ণ করা হবে। অর্থাৎ মোটামুটি এই প্রোগ্রামে ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে ৩২ কোটি গ্রামবাসীর জীবনযাত্রার মানকে তেমনভাবে উন্নত করে তোলা সম্ভব হবে, যে উন্নতির সুযোগ ১৯৫৬ সাল পর্য্যন্ত পেয়েছে মাত্র ৮ কোটি গ্রামবাসী।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নানা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যে বিরাট খরচ ও লেন-দেনের সমস্যা দেখা দেবে, সেটা কোথা থেকে কি ভাবে মেটানো হবে?

দেশের বহুমুখী উন্নতির জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে পাকা অর্থনৈতিক লেন-দেন ব্যবস্থা ও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হবে এ কথাটা সরকার খুব ভাল ভাবেই উপলব্ধি করেছেন। তার জন্য দেশের আর্থিক অবস্থা ও অর্থবন্টন ব্যবস্থার যথেষ্ট পরিবর্ত্তনও ঘটিয়েছেন, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পাঁচটি বছরেই এদেশের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক 'ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া'কে জনসাধারণের জাতীয় সম্পত্তিতে পরিবর্ত্তিত ক'রে জন-পরিচালিত 'স্টেট ব্যাঙ্কে' পরিণত করেছেন এই ভেবেই যে, তাতে শহর ছেড়ে সুদূর গ্রামে

চিত্তরঞ্জন দাশ—(গয়া ১৯২২) ; মহম্মদ আলী—(কোকনদ ১৯২৩) ; আবুল কালাম আজাদ—(বিশেষ অধিবেশন দিল্লী ১৯২৩, রামগড় ১৯৪০) ; মহাত্মা গান্ধী—(বেলগাঁও ১৯২৪) ; শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু—(কানপুর ১৯২৫) ; শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার—(গৌহাটি ১৯২৬) ; ডাঃ এম, এ, আন্সারী —(মাদ্রাজ ১৯২৭) ; পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু—(লাহোর ১৯২৯, লক্ষ্ণৌ ১৯৩৫, ফৈজপুর ১৯৩৭) ; সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল—(করাচী ১৯৩১) ; শেঠ রণছোড়লাল—(দিল্লী ১৯৩২) ; শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা—(কলিকাতা ১৯৩৩) ; বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ—(বোম্বাই ১৯৩৪ ও শ্রীযুক্ত স্থভাষচন্দ্রের পদত্যাগের পর ১৯৩৯ সনের শেষাংশ) ; শ্রীস্থভাষচন্দ্র বসু—(হরিপুরা ১৯৩৮, ত্রিপুরী ১৯৩৯) ।

১৯৩০ সনে আইন-অমান্য আন্দোলনের জন্য এবং ১৯৪১ সনে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের দরুণ ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেসের নেতারা কারাগারে থাকায় ও কংগ্রেস বেআইনী প্রতিষ্ঠান ঘোষিত হওয়ায় জাতীয় কংগ্রেসের কোন অধিবেশন হয় নি। ১৯৪৬ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়—পরে তিনি পদত্যাগ করায় আচার্য্য কৃপালনী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সাড়ম্বরে স্বাধীন ভারতে সর্ব্বপ্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন হয় এবং পট্টভী সীতারামিয়া কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন। ১৯৫০ সালে নাসিকে পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯৫১-৫৩ সালে জওহরলাল নেহরু সভাপতিত্ব করেন। ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে অমৃতসরে শ্রীযুক্ত ডেবর সভাপতিত্ব করেন।

নয়া ভারতের ভিত্তি

(প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা)

ভারতের প্রথম "পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার" কাজ কবে শুরু হয় ? এবং এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য কি ?

১৯৫১ সালে মার্চ মাসে ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ১৯৫১-১৯৫৬ সাল পর্য্যন্ত ৫ বছরের মধ্যে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করাই এর লক্ষ্য। এদেশের লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশী এবং দেশের আয়তন অত্যন্ত বিরাট হওয়ায় এবং দেশ বহুদিন পরাধীন থাকায় এ দেশের লোকের খাবার, বাসস্থান ও কর্ম্মসংস্থান-ব্যবস্থা খুবই খারাপ অবস্থায় ছিল। প্রজাতন্ত্র ভারতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিচারের ভিত্তিতে এই ব্যবস্থাগুলির উন্নতি ঘটিয়ে এমন সমাজ-ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়, যাতে প্রত্যেকেই আগের চেয়ে খেতে পরতে পান এবং সকলে মিলেমিশে সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করে জাতীয় জীবনের সুখ ও সম্পদ গড়ে তুলতে, নিজের নিজের অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিভিন্ন উন্নয়নকাজে মোট কত টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয় ?

প্রথম এই পরিকল্পনায় রকমারী উন্নয়ন কাজের খরচের জন্য ২০৬৮·৭৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়, পরে সহরগুলির বেকার সমস্যা মেটাবার জন্য এই বরাদ্দ বাড়িয়ে ২৩২৪·৫ কোটি টাকা করা হয়। কতকগুলি পরিকল্পনার কাজ চালাবার জন্য এইভাবে খরচ বরাদ্দ করা হয়েছে।

(ক) কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন ৩৭২·৬ কোটি টাকা (খ) সেচ ও বিদ্যুৎ— ৬৫৩·৫ কোটি টাকা (গ) যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা—৫৫৭·৭ কোটি টাকা

গ্রামেও এর লেনদেনের কাজ চালু হবে এবং প্রতিষ্ঠান হিসাবেও স্টেট ব্যাঙ্ক সর্ব্বত্র প্রসার লাভ করবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়ার কাজের ধারাও অনেকটা বদলে নিয়েছেন সরকার। এই ব্যাঙ্ক যে শুধু এখন মুদ্রা উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রকের কাজ করে বা বিদেশের মুদ্রা-বিনিময়ের ক্ষেত্রে লেনদেনের পাল্লাটা ঠিক রাখে তা নয়, এখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া সমবায়মূলক ঋণ-বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতিতে সরাসরি সহায়তা করছে। আগে গ্রামাঞ্চলে যথাযোগ্য সুদের হারে লেন-দেন করা একরকম অসম্ভবই ছিল। তাই টাকা না খাটিয়ে লোকে টাকা লুকিয়ে রাখতো। কিন্তু ঐ দুটি ব্যাঙ্কের পরিচালনা ব্যাপারে আমানত ও লগ্নী করার নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ায়—টাকা পয়সার লেন-দেনের কাজ দ্রুত বেড়ে চলেছে। ঘরে লুকানো বহু টাকাই এখন ব্যাঙ্কে জমা পড়ে জাতির কাজে লাগছে। জাতির মজুত টাকার পরিমাণটারও হিসেব পাওয়া যাচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের ব্যাপারে কারবারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়েও যাতে টাকা পয়সার অভাবে অসুবিধা না হয়, তার জন্যেও 'ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স করপোরেশন' এবং 'ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেণ্ট কর্পোরেশন' গড়ে তুলেছেন। এছাড়া সরকারী নিয়ন্ত্রণে ব্যবসা-বাণিজ্যের যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে—সেগুলিতে টাকার যোগান দিয়ে উন্নত করে তোলার জন্য—'ন্যাশন্যাল ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন' গঠিত হয়েছে। ছোট ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আরও বেশী গড়ে উঠলে লোকজনের কর্ম্মসংস্থান হবে, জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে ব'লেই বিভিন্ন রাজ্যে ছোট ছোট ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার এবং সেগুলিকে ঠিকমতো চালু রাখার জন্যও রাজ্যসরকারগুলি—'স্টেট ফিন্যান্স কর্পোরেশন' গঠিত করেছেন, এবং কেন্দ্রীয় সরকারও "সেণ্ট্রাল স্মল ইন্‌ডাস্ট্রিজ করপোরেশন" গঠিত করেছেন। এছাড়া জীবনবীমা কোম্পানীগুলিকে জাতীয়করণ করার ফলে—জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থের মস্ত বড় একটা অংশকে সরকার জাতীয় উন্নয়ন-পরিকল্পনার কাজে লাগিয়ে জনসাধারণের জীবন-বীমায় সঞ্চিত টাকাটাকেও বাড়িয়ে তোলার পথে সহায়তা করবেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করে তোলার ব্যবস্থা হয়েছে কি ভাবে?

ভারতের জাতীয় সরকার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর প্রবর্ত্তন করে—এদেশের জনসাধারণের মধ্যে জীবনযাত্রা ও আয়ের যে অসমতা রয়েছে, তা দূর করবার জন্য চেষ্টা স্বরু করেছেন। একথাটা অবশ্য লোকে সহজে বোঝেন না, এবং বিশ্বাসও করেন না, তার কারণ বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে এ পরিবর্ত্তন আনা যে কত জটিল ও শক্ত তা সকলে ভেবে দেখেন না। জীবন-যাত্রার মানের উন্নতি, টাকা লগ্নী করার ক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্ম্ম-সংস্থানের স্বযোগ ঘটিয়ে বেকারের সংখ্যা কমানো, এবং আয় ও সঞ্চিত ধনের অসমতা দূর করা তখনই সম্ভব হবে, যখন আমরা সবাই মিলে আমাদের বর্ত্তমান সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোটা আগাগোড়া বদলে নেওয়ার কাজ ও উপায়গুলোকে সম্পূর্ণ করে তুলতে পারবো। সেটি করতে হবে ধাপে ধাপে খুব হিসাব করে। সে কাজ আরম্ভ হয়েছে আমাদের দেশে। ইতিমধ্যেই সরকার নানারকমের অর্থনৈতিক হিসেবের উপায় অবলম্বন ক'রে রাজস্বনীতির কৌশলে আয় এবং ধনসম্পদের সমতা আনার কাজ শুরু করেছেন। যেমন ধরো ধাপে ধাপে বাড়তি আয়ের ওপর ক্রমশঃ চড়া হারে আয়কর ধরা হয়েছে—সম্পত্তির মোট মূল্যের ওপরেও ধাপে ধাপে সম্পত্তিকরের হারও বাড়ানো হয়েছে। এই ভাবে খুব বড়লোকদের বাড়তি টাকায় ভাগ বসিয়ে সেটা এনে সরকারী কাজে লাগিয়ে তার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের চাকরীর সংখ্যা ও আয়ের পরিমাণ বাড়াবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই উপায়ে জনসাধারণের আয় ও সম্পত্তির সামঞ্জস্য ঘটানো অনেকটা সহজ হবে, কিন্তু এগুলির চেয়েও দরকারী হলো—সমাজের নীচের স্তরে যে-সব মানুষ রয়েছে তাদের আয়ের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য কতকগুলি কার্য্যকরী উপায় অবলম্বন করা। সে কাজগুলি হচ্ছে—ধীরে ধীরে কল-কারখানা ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের

(ঘ) শিল্প ১৭৯·৯ কোটি টাকা (ঙ) সমাজ-সেবা—৩৭৬·৬ কোটি টাকা (চ) উদ্বাস্তু পুনর্বাসন—১২৯·৭ কোটি টাকা (ছ) বিভিন্ন খাতে ৫৫·১ কোটি টাকা।

১৯৫৪-৫৫ সাল পর্য্যন্ত ১৪০১·৩ কোটি টাকা এই পরিকল্পনায় খরচ করা হয় এবং ১৯৫৬ সালে মার্চ মাসের মধ্যে বাকী আরও ৭০০ কোটি টাকা খরচ করা হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কি ভাবে কতখানি সফল হয়েছে ?

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, তাই এই পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নের উপরেই জোর দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর দেশে যথেষ্ট খাদ্যাভাব ছিল। বহু টাকা খরচ করে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী ক'রে আমাদের খাদ্যাভাব মেটাতে হয়েছে ১৯৫৩ সাল পর্য্যন্ত ; কিন্তু পরিকল্পনার কাজ চালু হওয়ায় এই খাদ্য উৎপাদনের ব্যাপারেই সবচেয়ে বেশী ফললাভ করা গেছে। ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত খাদ্য উৎপাদন প্রায় ১ কোটি ১৬ লক্ষ টন বেড়ে গেছে। পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল, ১৪ লক্ষ একর জমি চাষের উপযোগী ক'রে তোলা। এর মধ্যে প্রথম ৪ বছরে প্রায় ১৩ লক্ষ একর জমি চাষের উপযোগী করে তোলা হয়েছে এবং ৯৫ লক্ষ একর অনুর্ব্বর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার ফলেই বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানীর পরিমাণ অনেক কমে গেছে। চাল, তুলা, তৈলবীজ, চিনি ও পাট উৎপাদন বাড়াবার ব্যাপারে এই পরিকল্পনার যা লক্ষ্য ছিল তা প্রায় সবগুলি ক্ষেত্রেই লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছেছে।

'জাতীয় সম্প্রসারণ' ও 'সমাজ-উন্নয়ন ব্যবস্থা' বলতে কি বোঝায় ?

এই পরিকল্পনায় নতুন ভাবে গ্রামগুলিকে গড়ে তোলবার ব্যবস্থা করা হয়। জাতীয় সম্প্রসারণ এবং সমাজ উন্নয়ন এই দুটি ব্যবস্থাকেও এই পরিকল্পনার ভিতরে ধরা হয়েছে। এই দুটি ব্যবস্থাতেও পরিকল্পনার ৫ বছরে ১২০০ গ্রাম-ঘাঁটিতে কাজ শুরু হয়েছে। ৬০ থেকে ৭০ হাজার অধিবাসী বাস করে এমন ১০০টি গ্রাম নিয়ে এক একটি গ্রাম-ঘাঁটি গঠন করা হয়েছে।

১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসের ভেতরেই এই নতুন ব্যবস্থায় কাজ করার ফলে ১০৫৫৫৭টি গ্রাম এবং ৮ কোটি ৮৩ লক্ষ গ্রামবাসী নানাভাবে উপকৃত ও লাভবান হয়েছে।

জাতীয় সম্প্রসারণ এবং সমাজ উন্নয়ন ব্যবস্থায় এইসব গ্রামে চাষবাস, পশুপালন, জোতজমির উন্নতি ও সংস্কার হয়েছে। সেচ, স্বাস্থ্য, সমাজসেবা, ও রাস্তাঘাট তৈয়ারীর কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে নতুন নতুন বিদ্যালয় স্থাপন ও সাধারণ বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করার ব্যবস্থাও হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-উন্নয়নের কাজের ধারাটি যাতে সমবায় প্রথায় কর্মীরা ঠিকমতো শিখতে পারেন সেই ব্যবস্থা, সমবায়-সমিতি গড়ে তোলার শিক্ষা এবং কাজকেও এই পরিকল্পনার ভিতরে ধরা হয়েছে। উন্নত ধরণের ঘরবাড়ী তৈরী, গ্রামসেবা প্রভৃতি বিষয়েও গ্রামবাসীদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ ও সেচব্যবস্থার কতখানি উন্নতি হয়েছে ?

স্বাধীনতার আগে ভারতবর্ষের বহু জমি জলসেচের অভাবে অনাবাদী পড়ে থাকতো এবং বৈদ্যুতিক শক্তি বহু জায়গায় পাওয়াই যেতো না। যেসব জায়গায় পাওয়া যেতো, তাও বেশ দুর্মূল্য ছিল। ফলে ছোট ছোট যন্ত্রপাতি বা কল কারখানা চালানো ও জনসাধারণের আরাম আয়াসের পথ অনেকখানি বন্ধ ছিল। সেইজন্য "প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়" ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থা ছাড়াও 'ভাকড়া-নাঙ্গাল', 'দামোদর উপত্যকা', 'হীরাকুদ', 'তুঙ্গভদ্রা' প্রভৃতি একাধিক "নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার" কাজ আরম্ভ হয় এবং পরিকল্পনার পাঁচটি বছরে সেগুলি প্রায় সবই গড়ে উঠেছে। দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে বিরাট ভাবে সাহায্য করছে। গাঙ্গুয়াল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এবং বোখারো ও তিলাইয়ার তাপজ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে প্রচুর বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে এবং দূরদূরান্তের গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৫৫ সালের

সংখ্যা বাড়িয়ে তুলে চাকুরীর সংখ্যা বাড়ানো, রকমারী নৈপুণ্যের কাজ শিখিয়ে জনসাধারণকে নিপুণ করে তোলা। যাতে সকলেই কিছু না কিছু সৃষ্টি করার কাজ শিখে নিজের পায়ে নিজেই ভর করে দাঁড়িয়ে নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করতে পারে। যে, যে কাজের যোগ্য লোক, সে সেই কাজেই যাতে বহাল হতে পারে, এবং তার যোগ্য বেতন ও মজুরী পায়, এসব দিকেও সরকার দৃষ্টি দিয়েছেন—যার ফলে ইতিমধ্যেই কল-কারখানার শ্রমিকদের আয় ও জীবন-যাত্রার মান আগের চেয়ে অনেকখানি উন্নত করে তোলা সম্ভব হয়েছে। অন্যান্য পেশার চাকুরিয়ারা যাতে অন্যায়ভাবে শোষিত না হয়, তার জন্য জাতীয় সরকার অনুসন্ধান ও সুবিচারের পথে একাধিক কমিশন ও বোর্ড নিয়োগ করে মালিকদের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা করছেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জাতীয় আয় মোট কি পরিমাণ বাড়বে ?

১৯৫৫-৫৬ সালে আমাদের জাতীয় আয়ের পরিমাণ—১০৮০০ কোটি টাকার মতো হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ হলে ১৯৬০-৬১ সালে জাতীয় আয়ের পরিমাণ বেড়ে প্রায় ১৩৪৮০ কোটি টাকার মতো হবে। অর্থাৎ শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ বাড়বে। ১৯৫১ সালে এদেশের লোকের গড়ে মাথাপিছু বার্ষিক আয় ছিল ২৫৫্ টাকা, ১৯৫৫ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে মাথাপিছু বার্ষিক আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে—২৮০্ টাকা। আর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে ১৯৬০-৬১ সালে মাথা পিছু বার্ষিক আয় বেড়ে হবে ৩৩০্ টাকা, খুব কম করে হিসেবে এমনটাই ধরা হয়েছে।

স্বাধীন ভারতবর্ষ কতদিক থেকে কি ভাবে উন্নত হয়েছে, সেটা কি ভাবে বোঝা যাবে ?

দেশের উন্নতি বা অবনতি নানাদিক থেকে নানাভাবের হিসাব বা পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায় এবং জাতীয় সরকার সে সমস্ত হিসাবই বছরে

বছরে ছাপিয়ে প্রকাশ করেন। সেই হিসাবের কিছু কিছু জানতে পারলে বা জানা থাকলে দেশের উন্নতি বা অবনতি হচ্ছে কি না সেটা সহজেই বোঝা যায়। আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত—সেই সমস্ত হিসাবে জেনে নিয়ে জাতীয় উন্নতির পথে আরও সহায়তা করা। আমাদের দেশের জাতীয় পরিকল্পনাগুলিতে উৎপাদনের হিসাব ও লক্ষ্য সম্পর্কে মোটামুটি কিছু হিসাব এখানে দিলাম, যা দেখলেই বুঝতে পারবে—স্বাধীন হওয়ার পর এদেশ কোন্ পথে চলেছে—উন্নতির দিকে না অবনতির দিকে?

	—যা হয়েছে—		—যা হবে—
১। কৃষিজাত পণ্য—	**(১৯৫০-৫১)**	**(১৯৫৪-৫৫)**	**(১৯৬০-৬১)**
(ক) খাদ্যশস্য—	৫ কোটি ৪০ লক্ষ টন	৬ কোটি ৫৬ লক্ষ টন	৭ কোটি ৫০ লক্ষ টন
(খ) তুলা—	২৯ লক্ষ গাঁইট	৪৩ লক্ষ গাঁইট	৫৫ লক্ষ গাঁইট
২। খনিজ পণ্য			
(ক) লৌহপিণ্ড—	১৫ লক্ষ টন	১৭ লক্ষ টন	১ কোটি ২০ লক্ষ টন
(খ) কয়লা—	৩ কোটি ২৩ লক্ষ টন	৩ কোটি ৬৮ লক্ষ টন	৬ কোটি টন
৩। কারখানার পণ্য			
(ক) ইস্পাত—	৯ লক্ষ টন	১২ লক্ষ টন	৪৩ লক্ষ টন
(খ) যন্ত্রপাতি—	৩১ লক্ষ টাকার	৫৪ লক্ষ টাকার	৩ কোটি টাকার
(গ) মোটর গাড়ি—	১৬৫১৯ খানা	২৩ হাজার খানা	৫৭ হাজার খানা
(ঘ) বাইসাইকেল—	১০১০০০ খানা	৪০৩০০০ খানা	১০০০০০০ খানা
(ঙ) ইলেকট্রিক ফ্যান—	১৯৪০০০ খানা	২৫৫০০০ খানা	৪৫০০০০ খানা
(চ) রেলের ইঞ্জিন—	একেবারেই হত না	১৪৫ খানা	৩০০ খানা
(ছ) ইলেকট্রিক ল্যাম্প—	১৪ কোটি	২৩ কোটি ৫৭ লক্ষ	৫০ কোটি
(জ) রেডিও—	৪৯ হাজার	৫৭ হাজার	৩ লক্ষ ৫০ হাজার
(ঝ) সেলাই কল—	৩৩ হাজার	৮১ হাজার	৩ লক্ষ
৪। শিক্ষা-ব্যবস্থা			
(ক) প্রাথমিক (৬-১১ বছরের ছেলে-মেয়ে) স্কুলে যায়—	শতকরা ৪২ জন	শতকরা ৫০ জন	শতকরা ৬০ জন
(খ) মাধ্যমিক (১১-১৪ বছরের ছেলেমেয়ে) স্কুলে যায়	শতকরা ১৪ জন	" ১৭ জন	" ১৯ জন
(গ) প্রাথমিক ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়—	১ লক্ষ ৭৫ হাজার	২ লক্ষ ৮৩ হাজার	৩ লক্ষ ৪৮ হাজার
(ঘ) শিক্ষকের সংখ্যা (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়)	৭ লক্ষ ৪০ হাজার	৯ লক্ষ ৭০ হাজার	১২ লক্ষ ১০ হাজার

কোন্ জিনিসটি কি ?

কাগজ কি থেকে তৈরী হয় ?

আজকাল সাধারণতঃ কাগজ তৈরী হয় কতকগুলি বিশেষ বিশেষ গাছের কাঠের আঁশ বা শাঁস থেকে। আমাদের দেশে কয়েকটি কাগজের কল, ঘাস ও বাঁশ থেকে কাগজ তৈরী করছেন। এই সমস্ত বিভিন্ন গাছের কাঠের শাঁস বা আঁশকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে গুঁড়ো করে ফেলে, তাকে পরিষ্কার করে নিয়ে, তাই দিয়ে একটা চটচটে মণ্ড বা লেইএর মত তৈরী করে—সেটাকে পাতলা পাতের আকারে জমিয়ে শুকিয়ে নিয়ে কাগজ তৈরী হয়। এ সব কাঠের শাঁস ছাড়াও ছেঁড়া ন্যাকড়া, পুরানো দড়ি, ছেঁড়া চট এসব পচিয়ে তার থেকেও কাগজ তৈরীর উপাদান করা যায়।

লেখবার কালি কি থেকে তৈরী হয় ?

আগেকার দিনে আমাদের দেশে জায়ফল বা চাল পুড়িয়ে কালি তৈরী হতো। কালি তৈরীর এই প্রথা এখনও পাড়াগাঁয়ের পাঠশালার ছেলেরা জানে। শহরের ছেলেরা বাজার থেকে যে সব কালির বড়ি বা কালি কেনে, তা সাধারণতঃ তৈরী হয় এক রকম গাছের আঠা থেকে, 'গ্যাল্স্' (Galls) বলে তাকে, তার সঙ্গে ফেরাস্ সালফেট (Ferrous sulphate) বলে লৌহজাত লবণ আর কিছু এ্যাসিড মিশিয়ে—এর সঙ্গে সেনেগাল গঁদ (Gum Senegal) বলে এরকম আঠাও মেশানো হয়, যাতে কালিটা কাগজ থেকে না উঠে যায়, সেইজন্য। 'লাল কালি' তৈরী হয় কিন্তু 'কোচীনিল' বলে এক রকম পোকার মরা দেহ গুঁড়িয়ে তার দেহের গুঁড়ো মিশিয়ে যে রং তৈরী হয়, তার সঙ্গে 'ব্রেজিল উড্' বলে এরকম কাঠের কাথ মিশিয়ে।

'লেড পেন্সিল' যেটিকে বলো সেটির সীস কি থেকে তৈরী ?

আসলে লেড পেন্সিলের সীসাটা সীসের তৈরী নয়, ওটা 'গ্রাফাইট' বলে এক রকম খনিজ পদার্থে তৈরী।

সেলুলয়েড্ কি থেকে তৈরী হয় ?

সাধারণতঃ গাছপালা প্রভৃতি উদ্ভিজের ভেতরে 'সেলুলোজ' বলে যে জিনিসটা পাওয়া যায় তার থেকে 'সেলুলয়েড' তৈরী হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা চলে তুলা জিনিসটাও এক ধরণের 'সেলুলোজ'—এই 'সেলুলোজ' জিনিসটা জলে গলে না, তাই নাইট্রিক এ্যাসিডের পরিপাক ক্রিয়ায় এটাকে গলিয়ে 'সেলুলোজ নাইট্রেট' তৈরী করা হয়। তারপর আবার ঐ 'সেলুলোজ নাইট্রেট'কে 'ইথার সালফিউরিক' আর 'এ্যাসিটোন' দিয়ে গলিয়ে নরম করা হয়। এই নরম জিনিস ছাঁচে ফেলে তখন মাথার কাঁটা, ছাতার বাঁট, চিরুণী প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিস তৈরী করা হয়। ইথার এ্যাসিটোন উবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জিনিসগুলো শক্ত 'সেলুলয়েডে'র আকার নেয়।

ইস্পাত আর সাধারণ লোহায় তফাৎ কি ?

ইস্পাতটা লোহা হলেও তাতে শতকরা ৫ থেকে ১৫ ভাগ পর্য্যন্ত কার্বন বা অঙ্গার মেশানো হয়। কার্বনের বদলে লোহার সঙ্গে নিকেল, টাংস্টেন বা ম্যাঙ্গানীজ মিশিয়েও ইস্পাত তৈরী করা হয়—এই ইস্পাতের বিশেষত্ব হলো যে তাতে মরচে ধরে না। এই ইস্পাতকে বলে 'স্টেন্‌লেস স্টীল'। সাধারণতঃ ছুরি কাঁটা 'স্টেন্‌লেস স্টীল' থেকেই তৈরী হয়।

পাকা সোনা ও গিনি সোনায় তফাৎ কি ?

পাকা সোনাটা হচ্ছে খাঁটি সোনা, তাতে অন্য কোনও ধাতুর ভেজাল নেই। কিন্তু গিনি সোনায় ২৪ ভাগ খাঁটি সোনার ভেতরে ২ ভাগ তামা কিংবা রুপা মিশিয়ে দেওয়া হয়। গিনিকে সেইজন্যই ২২ ক্যারেট সোনাও বলা হয়। এই অনুসারে বিভিন্ন ক্যারেটের সোনা তৈরী হয়।

কাঁসা ও জার্ম্মান সিলভার ধাতু কি ভাবে তৈরী হয় ?

কাঁসা বা কাংস্য ধাতু তৈরী হয় তামা ও টিন পরিমাণমত মিশিয়ে। 'জার্ম্মান সিলভার' কথাটা শুনে মনে করো না যেন জার্ম্মান দেশের রুপা।

আসলে ওটিতে থাকে ৫ ভাগ তামা, ২ ভাগ নিকেল ও ২ ভাগ দস্তা, এবং সবদেশেই তৈরী হয়। তবে ঐ ধাতুর প্রস্তুত-প্রণালী প্রথম জার্ম্মানীতেই আবিষ্কৃত হয় তাই এর নাম জার্ম্মান সিলভার।

কাঁচ কি করে তৈরী হয়?

সাধারণ কাঁচ সাধারণতঃ তৈরী হয় শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগ পরিষ্কার সূক্ষ্ম বালির গুঁড়ো, সিলিকা, ১০ থেকে ১৫ ভাগ সোডা-য়্যাশ, আর ১৫ ভাগ পটাশ এবং আরও দু'চারটি পদার্থ একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে,—তারপর বিশেষ ভাবে তৈরী মুছি বা পাত্রে রেখে খুব জোরালো আগুনে গলালেই কাঁচ হয়। কাঁচ তৈরী করতে সময় সময় এই মিশানো জিনিসটাকে তাড়াতাড়ি গলাবার জন্যে তার সঙ্গে কাঁচের টুক্‌রো মিশিয়ে দেওয়া হয়। নানা রকম কাঁচের নানা রকম মালমশলা—বোতল তৈরীর কাঁচে এসব ছাড়াও লাগে অক্সাইড অব আয়রণ, আর ক্রিস্টাল কাঁচ তৈরীর কাজে দরকার হয় পটাশ আর অক্সাইড্ অব্ লেড্।

চীনেমাটি জিনিসটা কি?

পোর্সিলেন-এর জিনিসকে আমরা সাধারণতঃ 'চীনেমাটির জিনিস' বলে থাকি। কিন্তু আসলে পোর্সিলেনের জিনিসগুলো চীনদেশের মাটি থেকে তৈরী হয় না। পোর্সিলেনের জিনিস তৈরী করতে সাধারণতঃ লাগে চারটি জিনিস—'কেওলিন' (kaolin) ব'লে খুব মিহি ধরনের একরকম মাটি, 'ফেলস্পার' ব'লে একরকম পাথরের গুঁড়ো, কোয়ার্জ আর বালি। এগুলো মিশিয়ে তারই মশলা দিয়ে তৈরী হয় পোর্সিলেনের জিনিস। চীনদেশেই সর্ব্বপ্রথম এই পোর্সিলেনের জিনিসের সন্ধান পাওয়া যায় এবং বহুদিন পর্য্যন্ত এক চীন ছাড়া এই 'পোর্সিলেন'-এর জিনিস তৈরী করার প্রথাটা জগতের অন্য সবারই অজানা ছিল। আমাদের দেশে এখন প্রচুর পোর্সিলেনের মাল তৈরী হচ্ছে।

মোম কি করে ও কি থেকে তৈরী হয় ?

মোম তিন রকমের হয়। প্রথমতঃ মৌমাছি মৌচাকে যে মোম জমা করে সেটা তার শরীর থেকে বেরোয়, তাকে বলা হয় বী-ওয়াক্স (Bee-wax) এ-ছাড়া আর এক রকম "মোম-পোকা" পাওয়া যায় চীন দেশে। তারাও শরীর থেকে মোম বার করে জমায় গাছের ডাল-পালায়। তিমি মাছের চর্ব্বি থেকে এক রকম মোম তৈরী হয়, তাকে বলা হয় 'স্পারমাসেটি'। জন্তু জানোয়ারের পশম থেকে 'ল্যানোলিন' বলে এক রকমের মোম পাওয়া যায়, এর সবগুলোকেই বলা হয় জান্তব মোম (Animal)। দ্বিতীয়তঃ হ'লো 'ভেষজ মোম' (Vegetable wax); এ-গুলো গাছ-পালা থেকেই পাওয়া যায়। ব্রেজিল দেশে তাল-জাতীয় (Palm) গাছ থেকে পাওয়া যায় 'কারনোবা' মোম (Carnauba wax)। জাপানের সুম্যাক্ (Sumack) মার্টল্‌বেরী (Myrtelberry) ও বে-বেরী (Bay Berry) গাছ থেকে এবং আখ থেকেও বাতি তৈরী করবার মোম পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ হ'লো 'খনিজ মোম', ইংরাজীতে যাকে বলা হয় 'প্যারাফিন্'। এটা সাধারণতঃ কেরোসিন ও পেট্রোল তৈরী হবার পর, সেই খনিজ তেলের ঝড়্‌তি-পড়তি যা প'ড়ে থাকে, তার থেকে তৈরি হয়। বর্ত্তমান জগতে এই খনিজ মোমই সবচেয়ে বেশী কাজে লাগে। বাজারে সস্তায় মোমবাতি যা দেখ তা ঐ 'প্যারাফিনে'র তৈরী।

গালা জিনিসটা কি ?

গালা জিনিসটা আসলে পাওয়া যায় এক রকম পোকার গায়ে—এই পোকাটির নাম ল্যাক্কিফার ল্যাক্কা (Laccifar Lacca), পোকাটি মাপে এক ইঞ্চির ৩০ ভাগের এক ভাগ। এই পোকাটির শরীর থেকেই এই গালা নামের জিনিসটি জন্মায় এবং এটাতে তাদের শত্রু ও আবহাওয়ার অত্যাচার থেকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা চলতে পারে। এই পোকাগুলি সাধারণতঃ

কয়েকটি বিশেষ বিশেষ জাতের গাছে বাসা বাঁধে এবং সেই গাছের রস খেয়েই বেঁচে থাকে।

ধুনা জিনিসটি কি এবং কোথা থেকে পাওয়া যায় ?

'ধুনা'টা সাধারণতঃ শাল গাছের আঠা বা শাল গাছের নির্য্যাস থেকে তৈরী হয়। আরও কয়েকটা বিভিন্ন গাছের নির্য্যাস আছে যাকে ধুনা হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

'গঁদ' জিনিসটা কি ?

'গঁদ' জিনিসটাও ঐ রকম গাছের আঠা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে বিভিন্ন শ্রেণীর গঁদ বিভিন্ন জাতের বাবলা গাছ থেকে পাওয়া যায় ; তুরস্ক, অস্ট্রেলিয়া, উত্তর আফ্রিকা, নিউজীল্যাণ্ড ও এশিয়া মাইনর থেকে এই গঁদ প্রচুর পরিমাণে আসে।

বোতল বা শিশির মুখের ছিপিতে যে কর্ক থাকে সেটা কি ?

কর্ক জিনিসটা আসলে হচ্ছে এক রকম 'ওক' (Oak) জাতের গাছের ছাল। কর্ক গাছ সাধারণতঃ পাওয়া যায় স্পেন, পর্ত্তুগাল, আর ভূমধ্যসাগরের উপকূলের কয়েকটা দেশে।

রবার জিনিসটা কি ও কোথায় পাওয়া যায় ?

রবার এক রকম গাছের আঠা—এই গাছকে সাধারণতঃ 'রবার' গাছই বলা হয়। এই গাছের ছাল কেটে দিলে এক রকম রস বেরোয়, সেই রস জমাট বাঁধিয়ে তৈরী হয় রবারের মূল উপাদান। রবার গাছ পাওয়া যায় বর্ম্মা, সিংহল, দক্ষিণ আমেরিকা, মালয় দ্বীপে ও কঙ্গো দেশে। এ ছাড়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অন্য বহু জিনিস থেকেও নকল রবার তৈরী হচ্ছে আজকাল।

কলিচূণ ও পাথুরে চূণে তফাৎ কি ?

কলিচূণ বা যে চূণ জলে গুলে দেওয়ালে কলি ফেরানো হয়, সেই চূণটা আসলে তৈরী হয় গুগ্‌লি শামুক, কড়ি, শাঁখ, ঝিনুকের খোলা পুড়িয়ে ;

পাথুরে চূণ তৈরী হয় 'ঘুটিং পাথর' ভাঁটিতে পুড়িয়ে। পাথুরে চূণকে বাতাসের সংস্পর্শে আনলে গুঁড়ো হয়ে যায়। এই গুঁড়ো চূণকে বলা হয় এয়ার ফ্লেক্‌ড (Air-flaked) চূণ। এই চূণ দেওয়াল গাঁথার কাজে লাগে। পানে খাবার জন্যে এই দু-রকম চূণই ব্যবহার করা হয়।

"গাটাপার্চ্চা" (Guttapercha) জিনিসটা কি ?

এটিও এক রকম গাছের রস থেকে তৈরী হয়। মালয় উপত্যকায় এই 'গাটাপার্চ্চা' গাছ প্রচুর পাওয়া যায়। গাটাপার্চ্চা গাছের কাণ্ডটা স্পঞ্জের মত সচ্ছিদ্র, কাজেই তা কোন কাজে লাগে না! তবে গাছের কাণ্ড আর ছালের মাঝামাঝি জায়গাটায় দুধের মত সাদা যে রস থাকে—সেটাকে জ্বাল দিলেই ইট রঙের 'গাটাপার্চ্চা' পাওয়া যায়। গাটাপার্চ্চাকে অনেকে রবার বলে ভুল করে, কিন্তু রবারের সঙ্গে এর তফাৎ অনেকখানি।

'বেকেলাইট' জিনিসটা কি থেকে তৈরী হয় ?

'বেকেলাইট' জিনিসটা তৈরী হয় কার্ব্বলিক এসিড আর ফরম্যাল-ডি-হাইড থেকে। এটা হলো একটা রাসায়নিক পদার্থ। এটি আবিষ্কার করেন প্রোফেসার এল, এইচ, বেকেল্যাণ্ড (L. H. Baekeland)—তার থেকেই এর নাম হয়েছে 'বেকেলাইট'। এটি এক শ্রেণীর 'প্লাস্টিক'।

বর্ত্তমানে 'প্লাস্টিক' বলে যে জিনিসটা চলে সেটার আসল নাম কি ?

বর্ত্তমানে প্লাস্টিক যাকে বলো তোমরা, সেটা 'গ্যালালিথ' (Galalith) ; এটা দুধের "কেসিন" বা ছানাজাতীয় পদার্থ থেকে তৈরী হয়। তাছাড়া রাসায়নিক প্লাস্টিকও রকমারি পাওয়া যায়।

এ্যালুমিনিয়ম জিনিসটা কি ?

এ্যালুমিনিয়ম ধাতুটি প্রচুর পরিমাণে পৃথিবীর মাটিতে নানা খনিজ পদার্থের সঙ্গে মেশানো রয়েছে বহুকাল থেকেই। ১৮২৭ খৃস্টাব্দে Woehler এই ধাতুটির সন্ধান দেন। কিন্তু এই ধাতুকে বৈদ্যুতিক উপায়ে সেই সব জিনিস থেকে আলাদা করে বার করে নেওয়ার ব্যবস্থা আবিষ্কার হয়

সর্ব্বপ্রথম ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে; এই ব্যবস্থার আবিষ্কার করেন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক হল (Hall) ও হামফ্রি ডেভি (Humphrey Davy)। এ্যালুমিনিয়ম খুব বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় বক্সাইট (Bauxite) বলে এক রকম খনিজ পদার্থে। এই বক্সাইট সর্ব্বপ্রথম পাওয়া যায় France-এ Le Baux) লে-ব বলে জায়গাটিতে। বক্সাইট থেকে Alumina বলে যে জিনিস পাওয়া যায় সেইটি এবং সালফিউরিক এসিড, জল ও ক্ষারজাতীয় দু-চারটে পদার্থ-ই হলো এ্যালুমিনিয়ম তৈরীর আসল মালমশলা।

তারপিন তেল কি থেকে তৈরী হয়? রজন জিনিসটা কি?

তারপিন তেল সাধারণতঃ কয়েক জাতের পাইন গাছ থেকে পাওয়া যায়। এই সব পাইন গাছের গায়ে V ভি-এর মত করে ছালটিকে কেটে ঠিক তার তলায় গাছের গায়ে একটা পাত্র বেঁধে দেওয়া হয়, গাছের গা থেকে রস গড়িয়ে গড়িয়ে এই পাত্রে জমা হয়। রসটা বাতাসের সংস্পর্শে এসে ঘোলা এবং চট্‌চটে হয়ে যায়। এই জিনিসটাকে বলা হয় 'ওলিও রেজিন' (Oleo Resin)। তখন এই জিনিসটাকে কারখানায় নিয়ে গিয়ে বাষ্পের সাহায্যে চোলাই করে তারপিন তেল বার করা হয়, আর বাদবাকি যেটা পড়ে থাকে তার থেকে তৈরী হয় 'রজন' (Resin)। 'রজন' যে কি জিনিস তা যারা 'এসরাজ' 'বেহালা' বাজায় তারা নিশ্চয় জানে।

কর্পূর কি করে তৈরী হয়?

কর্পূরটা আসলে উদ্ভিজ্জ পদার্থ—জাপান, ফরমোসা, চীন প্রভৃতি দেশে 'ক্যাম্ফর লরেল' (Camphor Laurel) বলে একরকম গাছ পাওয়া যায়। প্রথম সেই গাছের পাতা ছাল ও ছোট ছোট ডালপালাগুলিকে বাষ্পের সাহায্যে সিদ্ধ করে ক্বাথ বার করা হয়, তারপর সেই চুঁইয়ে বার করা রসটাকে গরম করা হয়,—গরম করবার সঙ্গে সঙ্গে উদ্বায়ী তেল (Volatile Oil) ও জলীয় অংশকে বার করে নেওয়া হয়, তখন তলায় পড়ে থাকে শুধু নোংরা-মেশানো কর্পূর। তখন সেটাকে আবার সাবলাইমড অবস্থায় পরিবর্ত্তিত

ক'রে বিশুদ্ধ কর্পূরে পরিণত করা হয়। (Sublimed অবস্থার অর্থ - এমন এক শ্রেণীর পদার্থ, যাকে উত্তাপের সাহায্যে নিরেট অবস্থা থেকে বাষ্পে পরিণত করে আবার সেই বাষ্পকে নিরেট অবস্থায় আনা হয়) আজকাল ঐ গাছ সিদ্ধ করে কর্পূর বার করা ছাড়াও—নকল কর্পূর তৈরী হচ্ছে 'পাইনিন' বলে একটি জিনিস থেকে। সেটি থাকে তারপিন তেলে।

'গ্লিসারিন' কি থেকে তৈরী হয় ? কে আবিষ্কার করেন ?

'গ্লিসারিন' পাওয়া যায় চর্ব্বি এবং তেল থেকে—তাছাড়া পচা মদ থেকেও গ্লিসারিন তৈরী হয়, তবে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে 'গ্লিসারিন' পাওয়া যায় সাবান তৈরীর কতকগুলি উপাদান থেকেই—কারণ সাবান তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে ওটা একটা বাড়তি জিনিস বা By-Product হিসাবে প্রস্তুত হয়। ১৭৭৯ খৃস্টাব্দে সি, শীলে (C. Scheele) বলে এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন।

"মেথিলেটেড স্পিরিট" কি থেকে তৈরী হয় ?

'মেথিলেটেড স্পিরিট'টা তৈরী হয় জলশূন্য সুর-সার বা এ্যালকোহল (Alcohol) থেকে। এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে এথিল এ্যালকোহল (Ethyl Alcohol) এটা তৈরী হয় নানারকম শস্য ফলমূল পচিয়ে তার রসটাকে চোলাই ক'রে। কিন্তু সাধারণ মদের সঙ্গে মেথিলেটেড স্পিরিটের তফাৎ অনেকখানি, কারণ যখন ঐ এথিল এ্যালকোহলের সঙ্গে পাইরিডিন ও সামান্য প্যারাফিন্ তেল মিশিয়ে দেওয়া হয়—তখনই নাম হয় মেথিলেটেড স্পিরিট।

সোডা ওয়াটার (Soda Water) কি ?

· আমরা যে সোডা ওয়াটার খাই তার সঙ্গে 'সোডা' নামক পদার্থটির কোন সম্বন্ধ নেই। সেটা আর কিছুই নয়—জলের সঙ্গে মেশানো কার্ব্বন ডায়ক্সাইড্ গ্যাস। এই সোডার জল সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন নিকোলাস পল ১৭৯০ সালে।

সোনারুপার গয়নায় যে মিনার কাজ থাকে,—সেই মিনা জিনিসটা আসলে কি?

সোনারুপার উপর যে মিনার কাজ দেখো, ঐ মিনাটা আসলে হচ্ছে এক রকমের রঙীন কাঁচ, তবে ঐ রঙীন কাঁচটি এমন উপায়ে তৈরী, যে বিভিন্ন ধাতুতে মিনার কাজের জন্য বিভিন্ন জাতের মিনা লাগে এবং সে সব মিনা গলাবার জন্য উত্তাপও বিভিন্ন মাপে লাগে।

'পিপারমেণ্ট' বা 'মেন্থল' জিনিসটা কি থেকে তৈরী?

'পিপারমেণ্ট' বা 'মেন্থল' পাওয়া যায় একরকম গাছ থেকে। এই গাছ চীন, জাপান ও বৃটেনের বনে জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়—আমাদের দেশের তুলসী গাছের মতই অনেকটা দেখতে এই গাছ। বৃটেনের লোকেরা চলতি কথায়—এই গাছকে 'মিণ্ট' গাছ বলে, কিন্তু ভেষজতত্ত্বে এর ল্যাটিন নাম হচ্ছে 'মেন্থা পেপেরিতা' (Mentha Peperita) বা সংক্ষেপে 'মেন্থ পিপ' গাছ। এই গাছের রসকে জ্বাল দিয়ে ও নানারকম বৈজ্ঞানিক উপায়ে এভাবে দানা বাঁধানো হয়। তখনই সেটাকে আমরা বলি পিপারমেণ্ট।

কোন্‌টি কবে প্রথম প্রচলন হলো?

সবচেয়ে আগে পৃথিবীতে কোথায় স্কুল খোলা হয়?

হাজার হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম স্কুল বা বিদ্যালয় তৈরী হয়, তবে সেটা বর্ত্তমান যুগের স্কুলের মত ছিল না, আশ্রমে গুরুর কাছে শিষ্যেরা দীক্ষা নিয়ে বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করতো—এবং জপ, তপ ও যোগ-সাধনাও করতো। ইউরোপের শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়ার কথা পাওয়া যায় গ্রীস দেশে—যীশুখৃষ্ট জন্মাবার প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে, সক্রেটিসের সময়ে সেখানে মোটামুটি শিক্ষার ব্যবস্থাও যে ছিল, তা

প্রমাণিত হয়েছে, তবে আজকালকার ধরণের স্কুলের ব্যবস্থা হয় যীশুখৃষ্ট জন্মাবার একশো বছর পরে রোম সভ্যতার যুগে। বিখ্যাত রোমান পণ্ডিত কুইন্‌টিলিয়ানের ছাত্র 'প্লিনি দি ইয়ঙ্গার' (Gaius Plinius Caecilius) তাঁর জন্মস্থান 'কোমো' বলে জায়গাটিতে প্রথম এই ধরণের স্কুল গড়ে তোলেন।

সংখ্যা ও গণিত শাস্ত্রের প্রচলন কোথায় সর্ব্বপ্রথম হয় ?

১, ২, ৩, প্রভৃতি সংখ্যা গণনা ও গণিত শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রথম প্রচলন হয় আমাদের ভারতবর্ষে। ভারতবাসীদের কাছ থেকেই প্রথম গণিত শাস্ত্র শেখে আরবরা, পরে প্রাচ্যের অন্য সব জাতিরা। বাগদাদের খলিফা মামুন-অর রসিদের দরবারের বিখ্যাত পণ্ডিত 'অল্‌-খাওয়ার-জমী' ভারতের প্রাচীন সংখ্যাগুলিকে সংশোধিত করেন। এই সংখ্যাগুলিই আন্দালুসিয়া থেকে ইউরোপে সংগৃহীত হয়, অর্থাৎ ভারতবাসীদের বহু পরে ইউরোপের লোকেরা এই গণিত-শাস্ত্র বা সংখ্যা গণনা করার বিদ্যা শেখে।

জ্যামিতি ও বীজগণিত প্রচলন কবে থেকে হয় ?

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষেই যে প্রথম অঙ্কশাস্ত্রের চলন হয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং বীজগণিত কথাটা পাওয়া গেছে ব্রহ্মগুপ্তের লেখা পুরানো পুঁথিপত্তরে। আর এই 'অ্যাল্‌জেব্‌রা' কথাটার জন্ম হয়েছে বাগদাদের এক অঙ্কশাস্ত্রের পণ্ডিত 'মহম্মদ-বিন মুসা-অল্‌ খাওয়ার জমী'র লেখা 'আল্‌ জেবর ওয়াল্‌-মুকাবালাই' বলে অঙ্কশাস্ত্রের বই-এর নাম থেকে। আল্‌ জেব্‌র কথাটা আরবী শব্দ, তার থেকে দাঁড়িয়েছে Algebra।

ম্যাপের প্রচলন কবে হয় ?

ভৌগোলিক মানচিত্র বা 'ম্যাপ'-এর প্রচলন কবে হয়, ঠিক করে বলা শক্ত ; তবে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের তৈরী—মাটিতে খোদাই করা একটা সেকেলে ম্যাপ রাখা আছে লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়মে। যীশুখৃষ্ট জন্মাবার প্রায় সাতশো বছর আগে 'অ্যানাক্সিম্যাণ্ডার' নামে এক গ্রীক

দার্শনিক এই ম্যাপ বা মানচিত্র তৈরী করেন। এরপর খৃষ্টীয় ১২০ অব্দে গ্রীক পণ্ডিত টলেমী-ই ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার ম্যাপ আঁকেন। অবশ্য এখনকার মানচিত্র আর সেকালের সেই সব মানচিত্রের যথেষ্ট তফাৎ আছে, কারণ তখন পৃথিবীর চেহারা সম্বন্ধেই তাঁদের অনেক উল্টো ধারণা ছিল।

পেন্সিলের প্রচলন কবে শুরু হয়?

'পেন্সিল' প্রাচীন কালেও যে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে বর্তমানে যে লেড্ পেন্সিল আমরা ব্যবহার করি তার চলন হয় ১৭৬১ সাল থেকে—নিউরেমবার্গের 'ক্যাসপার ফেবার' এই পেন্সিলের ব্যবসা শুরু করেন। অনেক পেন্সিলের গায়ে Johann Faber কথাটি যে লেখা থাকে, সেটা সেই বংশেরই নাম; কপিং (Copying) পেন্সিলের চলন হয় ১৮৯৬ সালে।

লেখবার কালি কবে থেকে ব্যবহার করা হচ্ছে?

লেখবার কালি আবিষ্কার কে করেন তা জানা যায় না, তবে ভারতবর্ষের লোকেরাই যে প্রথম কালি ব্যবহার করে লিখতে শেখে তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীনকালের পুঁথিপত্তর থেকে। ইউরোপেও যীশুখৃষ্ট জন্মাবার ৬০০ বছর আগেও যে কালি ব্যবহার করা হতো, তার প্রমাণ পাওয়া যায়—হিব্রু ভাষায় লেখা ফিনিসিয়ানদের পুঁথিপত্তর থেকে।

কাঁচের চলন হলো কোন্ দেশে?

কাঁচের আবিষ্কার কোথায় হয়েছিল সঠিক বলা শক্ত। তবে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা বলেন, মিশরেই প্রথম কাঁচের চলন হয় এবং সেটা প্রায় যীশুখৃষ্ট জন্মাবার ১৫০০ বছর আগে। মিশরের মাটি খুঁড়ে প্রাচীন কালের যে সব চিহ্ন পাওয়া গেছে, তার মধ্যে কাঁচও আছে। কিন্তু তাঁরা হয়তো জানতেন না সিংহলের রাজাদের ইতিহাস 'মহাবংশে' পাওয়া যায় যে শোভাযাত্রায়

আয়না নিয়ে যাওয়া হোত। এটি যীশুখৃষ্টের জন্মাবার আড়াই হাজার বছর আগের ইতিহাস।

রিক্সা গাড়ীর চলন কোন্ দেশে সর্ব্বপ্রথম হয় ?

রিক্সা গাড়ীর প্রথম চল হয় জাপানে ১৮৬৯ সালে। তবে এ নামের উৎপত্তি হয় 'জিন্ রিক্‌শা' বলে প্রথম প্রচলিত দু'চাকার গাড়ীর নাম থেকেই।

প্রথম ছবিওয়ালা বই কবে ছাপা হয় ?

১৪৮১ সালে ওয়েস্টমিনস্টারের ছাপাখানা থেকে উইলিয়াম ক্যাক্সটন যে বইটি ছাপেন সেইটিতেই সর্ব্বপ্রথম ছবির সন্ধান মেলে—বইটির নাম হচ্ছে "The Myrrour of the World"—এতে এগারখানি অতি সাধারণ শ্রেণীর কাঠখোদাই ব্লকে ছাপা ছবি ছিল।

কলম আর নিবের গোড়ার ইতিহাস কি ?

প্রাচীন কালের ভারতবর্ষ মিশর ও গ্রীসে হাঁসের পালক, খাগড়া ও কঞ্চির কলম দিয়ে পুঁথিপত্তর লেখা হতো। ইউরোপে ও অন্যান্য দেশেও এ ব্যবস্থা বহুদিন পর্য্যন্ত চলন ছিল—কিন্তু সর্ব্বপ্রথম পেতলের চাদর থেকে একটা নলের মত তৈরী করে তাকে কলমের মত কেটে কাজে লাগালেন এক জার্ম্মাণ, তাঁর নাম—এল, ভন্, ভইজ্ (L. Van. Weise)—১৪৬৯ সালে। তারপর ১৭৮০ সালে স্যামুয়েল হ্যারিসন, ডক্টর প্রিস্টলির জন্য পালকের কলমের ধাঁচে এক ইস্পাতের কলম তৈরী করলেন। সেই ধরণের কলম বাজারে বিক্রী হতে লাগলো ১৮০৩ সালে। ১৮২২ সালে কলমের পরিবর্ত্তে শুধু নিবটুকু কলে তৈরী করে বাজারে চালালেন—জন মিচেল।

তাস খেলার ইতিহাস কি ?

সবাই এতদিন জানতো যে তাস খেলাটা পাশ্চাত্য পদ্ধতির খেলা, এবং এর জন্ম পাশ্চাত্য দেশেই সর্ব্বপ্রথম। পণ্ডিত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে তাস-

খেলার চলন ছিল। তবে এখন যেমন তোমরা ৫২টা তাস নিয়ে খেলা করো, তখন তেমনি খেলা হতো ৯৬ থেকে ১১০ খানা তাস নিয়ে এবং সেই খেলাটাই আবার নতুন করে আমাদের দেশে চলন হয়। প্রাচীন ভারতের তাসে পদ্ম শঙ্খ, গদা, চক্র ও দেবদেবীর মূর্ত্তি আঁকা থাকতো। ওলন্দাজরা ভারতবর্ষ থেকে সেই খেলা শিখেই পাশ্চাত্যদেশে নতুন রকমের তাস খেলার প্রচলন করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। হরতন, ইস্কাবন, চিড়িতন, রুহিতন প্রভৃতি রঙের খেলা ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগীজরাই এদেশে আমদানী করেছে।

ঘোড়ার গাড়ীর চলন কোথায় এবং কবে থেকে শুরু হয়?

গাড়ীর পূর্ব্বপুরুষ হলো রথ—প্রাচীন ভারতে চারচাকা ও বহুচাকাওয়ালা রথ যখন চলতো—তখন ইউরোপের লোকেরা থাকতো বনে জঙ্গলে। ভারতবর্ষের কাছ থেকে গ্রীক ও রোমানরা রথে চড়তে শেখে। চার চাকায়-চলা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী সর্ব্বপ্রথম চলে লণ্ডন শহরে—১৬২৫ সালে। তারপর ১৮২৩ সালে চতুর্থ জর্জ্জের জন্মদিনে দু'চাকার টম্‌টম্‌ গাড়ী চলতে শুরু হলো লণ্ডনের রাস্তায়।

কেরোসিন তেলের চলন সর্ব্বপ্রথম কবে হয়?

প্রাচীনকালে এ্যাসিরিয়াবাসী, মিশরবাসী ও গ্রীকদের মধ্যে কেরোসিন তেলের চলন ছিল, তবে তারা জানতো না যে, ওটা দিয়ে আগুন বা আলো জ্বালানো যায়, তাই তারা তখন কেরোসিনের তেলকে মাটির তলা থেকে খুঁড়ে বার করে মালিশের ওষুধের মতই ব্যবহার করতো। ১৮২৬ সালে দূরদর্শী বৈজ্ঞানিক ডাঃ হিলড্রেথ আবিষ্কার করেন যে কেরোসিন তেল আগুন বা আলো জ্বালাবার কাজের উপযোগী।

সর্ব্বপ্রথম হাসপাতাল কোথায় স্থাপিত হয়?

যীশুখৃষ্ট জন্মাবার হাজার হাজার বৎসর আগেও মানুষের রোগ নিরাময়ের জন্য আরোগ্য নিকেতন বা হাসপাতালের ব্যবস্থা ছিল। ভারতবর্ষের 'চরক' 'সুশ্রুত' প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রাচীনতাই নাকি এর নিদর্শন। তবে

সেগুলি আধুনিক যুগের হাসপাতালের মত ছিল না। যাইহোক খ্রীশ্চান ধর্ম্মগুরু সেণ্ট বেসিলের (St. Basil) চেষ্টায় সর্ব্বপ্রথম হাসপাতাল স্থাপিত হয় ইটালীতে—খৃষ্টীয় ৩৬৯ সালে। হাসপাতাল প্রকাণ্ড প্রাসাদে স্থাপিত হয়েছিল, এবং সেখানে চিকিৎসক ও ধাত্রীদের জন্য আলাদা বাড়ীও ছিল, ওষুধ ও যন্ত্রপাতি তৈরীর জন্য ছোট ছোট কারখানারও ব্যবস্থা ছিল।

কলে সূতা কাটার ব্যবস্থা কবে শুরু হয় ?

কলে সূতা কাটার ব্যবস্থা শুরু হয় ১৭৫৮ সালে, তার আগে পর্য্যন্ত মানুষের হাতে আর চরকাতেই সূতা কাটা হতো। প্রথম সূতা কাটার কল তৈরী করেন উইয়াট (Wyatt) ও পল (Paul) বলে দু'জন বৈজ্ঞানিক।

নোটের প্রথম প্রচলন হয় কবে ?

প্রাচীনকালে চীনদেশে যে নোটের পূর্ব্বপুরুষ কাগজের মুদ্রা প্রচলিত ছিল একথা 'মার্কোপোলো'র কাছ থেকে ইউরোপ জানতে পেরেছিল। তবে তার বহু পরে ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বৃটিশ সাম্রাজ্যে কাগজের নোটের প্রচলন হয় ইংলণ্ডে। সেই নোটকে লোকে বলতো 'আব্রাহাম নিউল্যাণ্ড', কারণ তাতে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের প্রধান ক্যাশিয়ার আব্রাহাম নিউল্যাণ্ডের সই থাকতো।

ডাক বিভাগ, ডাকঘর ও ডাকবিলির ব্যবস্থার গোড়ার ইতিহাস কি ?

যীশুখৃষ্ট জন্মাবার ৫৫০ বছর আগে ডাক বিভাগের প্রথম প্রচলন করেন পারস্যের রাজা সাইরাস। তারপর রোম সম্রাট অগাস্টাস রোমানদের মধ্যে এ ব্যবস্থার চলন করেন। তারপর একাদশ লুই ১৪৭০ খৃঃ অব্দে ফরাসী দেশে এই ডাক-ব্যবস্থার নকল করেন এবং তাঁর এগার বছর পরে চতুর্থ এডওয়ার্ড ইংলণ্ডে সেই ব্যবস্থা বহাল করেন। তবে সেকালে শুধু রাজা-রাজড়াদের চিঠি বয়ে আনা-নেওয়াই ছিল ডাক বিভাগের কাজ। ১৬৪৯ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের সব জায়গায় সপ্তাহে একবার করে ডাকবিলির ব্যবস্থা করেন মিঃ

৫

ক্রমওয়েল। বর্ত্তমানে যে নিয়মিত রোজ ডাকবিলির ও ডাকঘরের ব্যবস্থা তোমরা দেখ এর সূত্রপাত হয় ১৬৬০ সালে, দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বের সময়। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসেও ডাক-প্রথার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। শেরশাহের আমলে এদেশে উৎকৃষ্ট ডাক বিভাগ চালু ছিল।

সর্ব্বপ্রথম সস্তা ডাক টিকিটের প্রচলন হয় কোথায় ?

সস্তা ডাক টিকিটের প্রথম প্রচলন হয় ইংলণ্ডে—১৮৪০ সালে। কালো কালিতে ছাপা হতো আর পেনীর হিসাবে বিক্রী হতো বলে, তার নাম হয়েছে 'পেনি ব্ল্যাক স্ট্যাম্প' (Penny Black Stamp). এই টিকিটকেই বলা হয় ডাক টিকিটের আদিপুরুষ। এই ডাক টিকিটের নক্সা তৈরী করেন 'বেকন' (Bacon) আর 'পেচ্' (Petch) বলে দুই শিল্পী, আর এই টিকিট ছাপার ব্লক তৈরী করেন 'চার্লস্ হিথ'।

পোস্টকার্ডের প্রচলন কবে শুরু হয় ?

পোস্টকার্ডের প্রচলন হয় সর্ব্বপ্রথম অস্ট্রিয়ার ডাক-বিভাগে, ১৮৬৯ সালে। তারপর তাদের দেখাদেখি ১৮৭০ সালে ইংলণ্ডেও পোস্টকার্ডের চলন হয়।

মনি-অর্ডার মারফৎ টাকা পাঠানো প্রথা কবে শুরু হয় ?

১৭৯১ সালে লণ্ডনের ক্রুচের্ড ফ্রায়ার্স অঞ্চলের একাউণ্ট্যাণ্ট, তাঁর নাম 'গসনেল'—এই 'মনি-অর্ডার' ব্যবস্থার এক প্রস্তাব তখনকার ঐ স্থানীয় ডাকঘরের কর্ত্তাদের কাছে পাঠান—কিন্তু তখন পোস্ট অফিস তাঁর সে কথাটায় কান দেয়নি—এর পরের বছরেই অবশ্য 'গসনেলে'র পরিকল্পনা অনুযায়ী 'মনি-অর্ডার' প্রথার চলন হয়—কিন্তু সেজন্য বাহাদুরী পায় অন্য লোকে। এই কাজ চলবার ছ'বছর পরে দেখা গেল যে ২৯৮ পাউণ্ড ক্ষতি হয়েছে। তখন সে ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর ১৮৩৮ সাল থেকে আবার 'মনি-অর্ডার' প্রথা চলে আসছে।

প্রথম ইংরাজী ডিক্‌সনারী কে তৈরী করেন ?

প্রথম ইংরাজী ডিক্‌সনারী (Dictionary) তৈরী করেন ডাক্তার সামুয়েল জনসন্। এটা করতে তাঁর সময় লেগেছিল ৮ বছর। এই ডিক্‌সনারী প্রকাশিত হয় ১৭৫৫ সালে।

আয়নার চলন সর্ব্বপ্রথম কোথায় হয় ?

আয়নার চলন প্রাচীনকালের ভারতে, মিশরে, গ্রীসে ও রোমে যে ছিল তা জানা যায়, তবে বর্ত্তমানে কাঁচের পেছনে পারা মাখিয়ে যে আয়না তৈরী হয় তার আবিষ্কার করে ভিনিসিয়ানরা—খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। ১৮৫৫ সালে ঐ ব্যবস্থাটাকে সর্ব্বপ্রথম পেটেণ্ট করে নেওয়া হয়।

চায়ের চলন হলো কবে থেকে ?

চায়ের গাছ আবিষ্কার করেন কে, সে কথা জানা যায় না। পৃথিবীর পুরানো সভ্যতার যুগে চীনে যে চায়ের প্রচলন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যীশুখৃষ্ট জন্মাবার ২৭৩৭ বছর আগে চীনের সম্রাট 'চাংপুং' সর্ব্বপ্রথম চায়ের প্রচলন করেন। ১৬১০ সালে চীন থেকে প্রথম চা ইংলণ্ডে যায় এবং তার পর থেকেই সেখানে চায়ের চলন হয়।

জীবন-বীমার প্রথম প্রচলন হলো কবে থেকে ?

জীবন-বীমার প্রচলন হয় সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডে এবং সেটা ১৭০৫ সালে।

দমকলের জন্ম হলো কবে ?

ফায়ার ব্রিগেড বা দমকলের প্রথম জন্ম হয়—যীশুখৃষ্ট জন্মাবার দু'শো বছর আগে এবং আগুন নেভাবার এই ব্যবস্থার আবিষ্কার করেন আলেকজান্ড্রিয়া সহরের 'সিসিরাস'। তবে সেই ফায়ার ব্রিগেড বা দমকল বাহিনী এখনকার মতো ছিল না। পাম্পে চলা দমকলের আবিষ্কার করেন, 'জন ব্রেথওয়েট' বলে একজন ইংরেজ ১৮৩০ সালে।

ছাপা বইয়ের সন্ধান প্রথম কোথায় পাওয়া যায় ?

হাতে লিখে একখানি গ্রন্থের বহু নকল করেই প্রাচীন কালে গ্রন্থের প্রচার করা হতো। কিন্তু ছাপা বই বলতে যা সর্ব্বপ্রথম পাওয়া যায়, তা নাকি চীন দেশেই পাওয়া গেছে। যীশুখৃষ্ট জন্মাবার প্রায় দু'শো বছর আগে চীনদেশে কাঠের তক্তার ওপর গ্রন্থের এক একটি গোটা পাতাই খোদাই করে লেখা হতো। তারপর তাতে কালি মাখিয়ে ছাপ নিয়ে গ্রন্থের একাধিক নকল করা হতো। কাজেই চীনদেশেই সর্ব্বপ্রথম ছাপা বই তৈরী হয়েছিল বলে ধরা হয়। এই প্রথায় ইউরোপের প্রথম ছাপা বই হচ্ছে 'বিবলিয়া পপারাস' বা গরীবদের বাইবেল—এরই একটি বই 'ম্যাজারিন বাইবেল' নামে বিখ্যাত —এগুলি ছাপা হয় ১৪৫৬ সালে।

ক্রিকেট খেলার গোড়ার ইতিহাস কি ?

ক্রিকেট খেলা শুরু হয় কবে, ঠিক করে তা বলা যায় না, তবে যতদূর জানা যায় এবং ক্রিকেট ম্যাচ বলতে যা বোঝায়, সর্ব্বপ্রথম তার খেলা হয় ইংলণ্ডের ক্লাপহামের সাধারণ মাঠে এবং সেটা ১৭০০ সালে। তবে সেকালের সেই ক্রিকেট খেলা আর একালের খেলার মধ্যে যথেষ্ট তফাৎ আছে।

বাস (Bus) বা ওম্‌নিবাসের (Omnibus) গোড়ার ইতিহাস কি ?

এখন তোমরা 'বাস' বলতে বোঝ 'মোটরবাস', কিন্তু সেকালে ঐ 'ওম্‌নি-বাস' অর্থে বোঝাতো 'সর্ব্বসাধারণের জন্য যে গাড়ী',—এবং এই গাড়ীর পূর্ব্ব-পুরুষ হলো 'ঘোড়ায় টানা বড় গোছের গাড়ী'। এই গাড়ী টানতো তিনটি ঘোড়ায়—আর বাইশ জন লোকের বসবার মত জায়গা থাকতো এই গাড়ীতে। এই ধরণের 'ওম্‌নিবাস' চলার ব্যবস্থা সর্ব্বপ্রথম হয় লণ্ডনের রাস্তায় ১৮৯২ সালে। যিনি এই ব্যবস্থা করেন তাঁর নাম জর্জ্জ শিলিবার (George Shiliber).

লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগারের গোড়ার ইতিহাস কি? সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থাগারের সন্ধান কোথায় মেলে?

ঐতিহাসিকেরা বলেন—প্রাচীন কালে ভারত ও মিশরের মন্দিরে এবং রাজাদের ধনভাণ্ডারে দামী দামী পুঁথিপত্তর সংগ্রহ করে রাখা হতো। সেকালে এইভাবেই ধীরে ধীরে গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরী গড়ার পরিকল্পনা গড়ে ওঠে। সেকালের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থাগার বলতে যেটির খবর জানা গেছে —সেটি তৈরী হয়েছিল যীশুখৃষ্ট জন্মাবার ১৯০০ বছর আগে। এই গ্রন্থাগার তৈরী করেন এসিরিয় রাজারা—প্রাচীন নিনেভার সার্দ্দানেপেলাস শহরে। এর প্রায় চারশো বছর পরে মিশরের 'টেল্‌-এল্‌-আমার্ণ্য' গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রাচীন যুগে সাধারণের পড়বার জন্য পাঠাগার প্রথম স্থাপিত হয়—গ্রীসের এথেন্স শহরে। সেটা হয় যীশুখৃষ্ট জন্মাবার ৫১০ বছর আগে, অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে। সাধারণের জন্য পাঠাগার ধরণের লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন রোম সম্রাট অগাস্টাস—প্রাচীনকালের রোমে।

প্যারাসুটের গোড়ার ইতিহাস কি?

১৮৮৩ সালে ফ্রান্সের লিঁয় শহরের 'সেবাস্টিয়েঁ-লে-নরমাঁদ' বলে একটি লোক একটা প্রকাণ্ড ছাতার মতো তৈরী করে চার পাশের কোণগুলিতে দড়ি বেঁধে 'মঁপেলিয়ে অবজারভেটরি'র চূড়ো থেকে তাই ধরে নীচে লাফিয়ে পড়ে। তাতে তার দেহে নাকি কোন আঘাত লাগেনি। এইটিই হলো প্রথম প্যারাসুট তৈরীর গোড়ার ইতিহাস।

জুতার ইতিহাস কি?

প্রাচীনকালে চীন ও ভারত সবচেয়ে সভ্য ছিল সে কথা জান, কাজেই এই দুটো দেশেই 'জুতা'র পূর্ব্বপুরুষ 'কাষ্ঠ পাদুকা' বা 'খড়ম' জাতীয় জিনিসের প্রচলন যীশুখৃষ্ট জন্মাবার বহু আগেই ছিল। তারপর মিশর, গ্রীস ও রোমে চামড়ার 'স্যাণ্ডালের' জন্ম হয়—কিন্তু ইউরোপে পা ঢাকা দেবার ব্যবস্থা শুরু

হয় নরম্যানদের সময়—একাদশ শতাব্দীতে। খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ ইউরোপের মেয়ে পুরুষ সবাই জুতো-পরা শুরু করে।

ছাতার ইতিহাস কি ?

ছাতার ইতিহাস বহু পুরানো, কারণ ভারতের আদিকালের পুরানো পুঁথিপত্তরে এবং ইতিহাসেও রাজছত্র বা ছাতার কথা পাওয়া যায়। পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রথম ছাতার চলন হয় ইংলণ্ডে। ১৭৫৬ সালে জোনাস হানওয়ে বলে একজন ইংরেজ ভারতবর্ষ থেকেই ছাতার সন্ধান পেয়ে প্রথম ছাতা মাথায় দিয়ে ইংলণ্ডের রাজপথে বেরিয়েছিলেন। তাঁর ছাতাটি তৈরী হয়েছিল পাতলা চামড়া দিয়ে। তখন ইংলণ্ডের ছেলেবুড়ো সবাই তাঁকে এই ছাতা মাথায় দেওয়ার জন্য ঢিল মেরেছিল, ঠাট্টা করেছিল। কিন্তু পরে সবাই বুঝতে পেরেছিল ছাতার প্রয়োজনীয়তা কি।

সিমেণ্টের ব্যবহার কবে থেকে শুরু হয় ?

'সিমেণ্ট' কথাটা আসলে হচ্ছে ল্যাটিন ভাষার একটি শব্দ, আর তার মানে শক্ত পাথর। বর্ত্তমানে জগতে সিমেণ্টের ব্যবহার আরম্ভ হয় ১৮৪০ সাল থেকে।

আবিষ্কারের ইতিহাস

কয়লা আবিষ্কারের গোড়ার ইতিহাস কি ?

কয়লা আবিষ্কারের গোড়ার ইতিহাস যতটুকু জানা যায় তাতে করে পাওয়া যায় যে, ১৪৩৬ সালে একজন ইতালীয় পণ্ডিত ইনিয়াস পিচোলমনি (Aeneas Piccolmony) কার্ডিন্যাল অ্যালবার্গাতিকে (Cardinal Albergati) সঙ্গে নিয়ে একবার ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে যান। সেখানে তিনি দেখেন যে সেখানকার লোকেরা মাটি খুঁড়ে একরকম 'পাথরের মত জিনিস' বার করে তাই দিয়ে আগুন জ্বালায়। এইটাই কয়লা আবিষ্কারের

গোড়ার ইতিহাস। কিন্তু খনি খুঁড়ে কয়লা বার করে ব্যবসা বাণিজ্যে লাগানোর কাজ শুরু হয় তার অনেক পরে—খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে।

ভিটামিন আবিষ্কারের ইতিহাস কি ?

'ভিটামিন' বস্তুর নামকরণ করেন পোল্যাণ্ডের রাসায়নিক 'ক্যাসিমি ফাঙ্ক'। তিনি ১৯১১ সালে বেরিবেরি রোগের আরোগ্যবিধি খাদ্যতত্ত্বের মধ্যে আবিষ্কার করেন। Vitamines শব্দটি গোড়ায় Vitamine বলে পরিচিত হয়। ল্যাটিন ভাষায় Vita শব্দের অর্থ 'জীবন' এবং Amine হচ্ছে একরকমের রাসায়নিক পদার্থ যেটি ফাঙ্ক সাহেব তাঁর আবিষ্কৃত পদার্থটিতে আছে বলে ঘোষণা করেন ; তাই ফাঙ্ক সাহেব তাঁর আবিষ্কৃত জিনিসটির নাম দেন Vitamine ; কিন্তু পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রোফেসার ড্রামণ্ড' প্রমাণ করেন যে 'ফাঙ্কের' আবিষ্কৃত পদার্থে Amine শ্রেণীর কোনও পদার্থ-ই নেই। তাই তখন থেকে পুরোপুরী Amine কথাটি বাদ না দিয়ে শুধু তার শেষের অক্ষর Eটি বাদ দিয়ে নাম করা হয় Vitamins. এর পরে বিভিন্ন শ্রেণীর ভিটামিন আবিষ্কার করেন এফ. জে. হফ্‌কিনস্ (ইংরাজ), আইজম্যান (ওলন্দাজ) ও উইনডাম (জার্মান) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা।

বাষ্পে চালিত রেলওয়ে ইঞ্জিনের গোড়ার ইতিহাস কি ?

প্রথম বাষ্পে চালিত ইঞ্জিন তৈরী হয় ১৮০২ সালে। এটি তৈরী করেন রিচার্ড ট্রিভিথিক (Richard Trevithick). এই ইঞ্জিনটি ঘণ্টায় মাত্র ৫ মাইল বেগে চলতে পারতো। এর পরে ১৮১৩ সালে উইলিয়াম্ হেড্‌লি একটি ইঞ্জিন তৈরী করেন তার নাম 'পাফিং বিলী' (Pufing Billy). কিন্তু কাজে লাগাবার মত ইঞ্জিন প্রথম তৈরী করলেন জর্জ্জ রবার্ট স্টিফেনসন ১৮১৪ সালে। তাঁর তৈরী 'রকেট' (Rocket) নামে ইঞ্জিনটা, সেকালের বিখ্যাত ইঞ্জিন, কারণ সেটি ১৮২৯ সালে ঘণ্টায় ২৪ থেকে ২৯ মাইল বেগে চলে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিল।

বর্ষাতি বা 'ওয়াটারপ্রুফ' কাপড়ের আবিষ্কার কবে হয় ?

জানা যায়, প্রাচীনকালে চর্ব্বি ও তেলে ভিজিয়ে কাপড়কে জলনিরোধক করা হতো, তবে রবারের সাহায্যে বর্ষাতি কাপড় তৈরীর ব্যবস্থা সর্ব্বপ্রথম ফরাসী দেশেই করেন বেস্‌সন (Besson) ১৭৯৩ সালে। তবে সেটা কার্য্যকরী হয় খুব বেশী, যখন ১৮১৮ সালে জেমস্‌ সাইম (James Syme) বলে এক চিকিৎসা শাস্ত্রের ছাত্র প্রথম পরীক্ষা করে জানলেন আলকাতরা থেকে ন্যাপথা বলে যে রাসায়নিক পদার্থটি পাওয়া যায়, তার সাহায্যে অতি সহজেই শুক্‌নো রবারকে তরল করে নেওয়া যায়।

রবার আবিষ্কারের ইতিহাস কি ?

অনেক দিন আগে স্পেন থেকে একবার এক অভিযানকারী দল মেক্সিকোতে আসে—তারাই প্রথম দেখে যায় যে মেক্সিকোতে এক জাতের গাছের গা থেকে চট্‌চটে রস গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে—আর সেই রস হাওয়ায় শুকিয়ে নিয়ে সেখানকার লোকেরা তারই তাল পাকিয়ে বলের মত লোফালুফি খেলা করে। এ কথাটা তারাই ফিরে গিয়ে তাদের দেশে গল্প করে। তারপর ১৫৩০ সালে ফ্রান্সিকো পিরাজিরো বলে স্পেনের এক বীর অভিযানে বেরুলেন এবং এই অভিযানে তিনি দক্ষিণ আমেরিকার বহুদেশ আবিষ্কার করেন ও দখল করে নেন। তার মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলের পেরু (Peru) বলে জায়গা জয়টাই তাঁর সবচেয়ে বড় জয়। এই পেরু জায়গাটিতেই তাঁরাও ঐ রবার গাছের সন্ধান পান। তখন ঐ আঠা নিয়ে তাঁরা জল আটকাবার জন্য জামায় ও জুতায় লাগালেন। রবার আবিষ্কারের গোড়ার কথা এইটাই বটে, কিন্তু ঐ জিনিসটির নাম তখন রবার (Rubber) ছিল না। এই 'রাবার' নামটি দেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জোসেফ প্রিস্‌ট্‌লি ১৭৭০ সালে ; কারণ তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন এই জিনিসটি পেনসিলের দাগের ওপর রগড়ালে দাগ উঠে যায়। ইংরেজী ভাষায় 'রাব্‌' মানে হলো রগড়ানো—তাই নাম হলো 'রাবার'।

ইলেকট্রিক লাইটের আবিষ্কার হয় কবে এবং কে করেন ?

ইলেকট্রিক লাইট অর্থাৎ বিদ্যুতের সাহায্যে আলো জ্বালানোর ব্যবস্থা যে হতে পারে এ তথ্য আবিষ্কার করেন স্যার হাম্‌ফ্রে ডেভি ১৮০১ সালে। তবে সেটা বর্ত্তমানে এই বাল্‌বের (Bulb) আলোর ব্যবস্থা নয়, সেটা ছিল বৈদ্যুতিক আর্ক ল্যাম্প, অর্থাৎ যে ল্যাম্পে সাধারণতঃ দুটো 'কার্ব্বনের' পেনসিলকে মুখোমুখি রেখে বিদ্যুতের সাহায্যে আলো জ্বালানো হয়। এর পরে ১৮০৮ সালে সি. এফ. ব্রুশ বলে এক বৈজ্ঞানিক এই আর্ক ল্যাম্পকেই (Arch Lamp) কিছু উন্নত করে নিয়ে কারখানা ও রাস্তার বৈদ্যুতিক আলোকের কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের ঘরে দুয়ারে বাল্‌ব (Bulb) লাগিয়ে যে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালবার ব্যবস্থা দেখ, তার সৃষ্টি করেন টমাস আল্‌ভা এডিসন—১৮৮০ সালে।

টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেন কে ?

টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেন এস. এফ. বি. মোমর্স বলে এক আমেরিকান বৈজ্ঞানিক—বিদ্যুতের সাহায্যে তিনি সঙ্কেত পাঠাতে সমর্থ হন সর্ব্বপ্রথম ১৮৩৫ সালে, কিন্তু টেলিগ্রাফের ব্যবস্থার সূত্রপাত হয় ১৮৪৪ সালের ২৪শে মে তারিখে।

টেলিফোন আবিষ্কার করেন কে ?

আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল্। সেটা হলো—১৮৭৬ সালের কথা। ইনি জাতিতে আমেরিকান ছিলেন এবং প্রথম জীবনে মূক-বধিরদের স্কুলে মাষ্টারী করতেন।

ফটোগ্রাফ ও ক্যামেরা আবিষ্কারের ইতিহাস কি ?

ক্যামেরা আবিষ্কার করেন—'ব্যাপটিস্টা পোর্টা' বলে একটি লোক ১৫৫৮ খৃঃ অব্দে। সেই ক্যামেরার নাম হচ্ছে 'ক্যামেরা অবস্‌কিউরা (Camera Obscura), বর্ত্তমানে ক্যামেরার পূর্ব্বপুরুষ সেটাই। ১৮৩৯ সালে 'দ্যগর্‌রে' (Dagrre) ও 'নীপসে' (Niepce) ফটোগ্রাফীর উন্নতি

ও মূলতথ্য আবিষ্কার করেন। ফটোর ফিল্ম ও কোডাক্ ক্যামেরার আবিষ্কার করেন জর্জ্জ ইস্টম্যান বলে এক আমেরিকান ১৮৮৫ সালে। ফটোগ্রাফের জন্য ড্রাই প্লেট তৈরী করার প্রথা আবিষ্কার করেন স্যার জোসেফ উইলসন সোয়ান।

জলাতঙ্ক রোগের ঔষধ আবিষ্কার করেন কে ?

লুই পাস্তর ১৮৮৫ সালে পাগলা কুকুর কামড়ালে মানুষের যে 'জলাতঙ্ক' রোগ হয়—তার ঔষধ 'হাইড্রোফোবিয়া এণ্টিটক্সিন' আবিষ্কার করেন।

বসন্ত রোগের টীকা দেবার প্রথা আবিষ্কার করেন কে ?

বসন্তের টীকা দেওয়ার প্রথা প্রচলন করেন—এডওয়ার্ড জেনার। তিনি গরুর গায়ের বসন্তের বীজাণু নিয়ে তাঁর নিজের ছেলের উপর এর পরীক্ষা করেন এবং ১৭৯৬ সালের ৪ঠা মে তিনি জেমস ফিপ্স্ বলে একটি ছেলেকে টীকা দেন, এই তাঁর প্রথম সাফল্য। কিন্তু এর আগে চীনে ও ভারতবর্ষে টীকা দেওয়ার প্রথা যে বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল সে কথা জানা গেছে। আয়ুর্ব্বেদে টীকা দেওয়াকে 'গো-মসূর্যাধান' বলে।

রেডিয়াম আবিষ্কার করেন কে ?

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিলা বৈজ্ঞানিক, তাঁর নাম মাদাম কুরী—তিনি রেডিয়াম আবিষ্কার করে জগতের অশেষ কল্যাণ করে গেছেন। তাঁর জন্ম হয় পোল্যাণ্ডের এক স্কুল মাষ্টারের ঘরে ১৮৩৮ সালের ৮ই নভেম্বর তারিখে। তিনি ১৯০৩ ও ১৯১১ সালে দু'বার নোবেল প্রাইজ পান। প্রথমবার পেয়েছিলেন 'রেডিও একটিভিটি'র তত্ত্ব আবিষ্কারের দরুন—এবং দ্বিতীয়বারে পান রেডিয়াম আবিষ্কার করে।

টেলিভিশন যন্ত্রের আবিষ্কার করেন কে ?

কেউ কেউ বলেন একজনের চেষ্টায় টেলিভিশন আবিষ্কার হয়নি, হয়েছে বহু বৈজ্ঞানিকের চেষ্টা ও গবেষণার ফলে। টেলিভিশন সম্বন্ধে এখনও গবেষণা চলছে। তবে টেলিভিশনের আবিষ্কারে সবচেয়ে বড় দান যাঁর—

তাঁর নাম জে. এল্. বেয়ার্ড—তিনি ১৯২৬ সালে এই টেলিভিশনকে জগতের সামনে আনেন।

সিনেমার আবিষ্কার করেন কে?

সিনেমা বা সচল ছবি দেখানোর যে ব্যবস্থা—প্রথম তার আবিষ্কার করেন ১৮৯১ সালে জেঙ্কিন্‌স্ বলে এক বৈজ্ঞানিক—তখন তাঁর যন্ত্রের নাম ছিল "ফ্যাণ্টাস্কোপ" (Fantascope). এই যন্ত্রে জনসাধারণকে পর পর কয়েকটি বিভিন্ন ভঙ্গীর আঁকা ছবির সাহায্যে প্রথম সচল ছবি দেখানো হয় ১৮৯৪ সালে। তারপর বায়স্কোপের প্রতিফলন যন্ত্র বা 'প্রোজেক্টর' তৈরী করেন 'লুমিয়ের' বলে এক ফরাসী বৈজ্ঞানিক ১৮৯৫ সালে। 'উইলিয়াম ফ্রিয়েজ গ্রীন' বলে এক বৈজ্ঞানিকও বর্ত্তমান সিনেমার যন্ত্রপাতির বহু উন্নতি করেন।

এরোপ্লেন আবিষ্কার করেন কে?

বর্ত্তমানে এরোপ্লেনের আবিষ্কারকর্ত্তা বলে যাঁদের ধরা হয়, তাঁরা দুই ভাই, তাদের নাম হচ্ছে—'অরভিল' আর 'উইলবার' রাইট। এঁরা আমেরিকার লোক। এঁরা দুই ভাইয়ে তাঁদের আবিষ্কৃত এরোপ্লেনে চড়ে সর্ব্বপ্রথম সাফল্য লাভ করেন ১৯০৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে।

রেডিও আবিষ্কার করেন কে?

'ডাঃ জি, মার্কনী'কেই রেডিওর আবিষ্কর্তা বলে ধরা হয়; ১৮৯৫ সালে তাঁর গবেষণা আংশিকভাবে সফল হয়। তবে রেডিওর আবিষ্কারে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের দানও কম নয়। সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক হার্টজ এই গবেষণা শুরু করেন—কিন্তু মার্কনীই ১৯০১ সালের ১২ই ডিসেম্বর প্রথম বেতারবার্ত্তা পাঠাতে সক্ষম হন—সেই বেতারবার্ত্তায় মাত্র 'S' শব্দটি নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের 'পলটু' শহর থেকে ইংলণ্ডে পাঠানো সম্ভব হয়েছিল।

সর্ব্বপ্রথম ইলেক্‌ট্রিসিটি আবিষ্কার করেন কে ?

সর্ব্বপ্রথম 'ইলেক্‌ট্রিসিটি' আবিষ্কার করেন কে, তা সঠিক বলা যায় না, কারণ ইলেক্‌ট্রিসিটি বা বৈদ্যুতিক শক্তি যে দুটি পদার্থের ঘষাঘষিতে উৎপন্ন হয়, সে কথা যীশুখৃষ্ট জন্মাবার দু'শো বছর আগেও লোকে জানতো—তবে ইলেকট্রিসিটির তাপ, রাসায়নিক কার্য্যক্রম ও প্রবাহ বা ইলেক্‌ট্রিক কারেণ্ট এই সব সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ হয় যীশুখৃষ্ট মারা যাবার প্রায় সতের শো বছর পরে, এবং সব জিনিসেই যে ইলেক্‌ট্রিসিটি বর্ত্তমান সেটা ষোড়শ শতাব্দীতে রাণী এলিজাবেথের চিকিৎসক উইলিয়াম গিলবার্টই প্রথম আবিষ্কার করেন। এর পরে 'বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন'—সপ্তদশ শতাব্দীতে বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণা করেন ও নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। ইলেক্‌ট্রিক্ ব্যাটারী সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন 'এ্যালস্থাণ্ড্রো ভোল্টা' (Alssandro Volta)।

দিয়াশলাই আবিষ্কারের গোড়ার ইতিহাস কি ?

সর্ব্বপ্রথম ঘষাঘষি করে আগুন জ্বালাবার মত দিয়াশলাই তৈরী করেন 'ফ্রাঁসোয়া দেরোন' (Francios Derosne) ১৮১৬ সালে। কিন্তু সাধারণের ব্যবহার করবার উপযোগী দিয়াশলাই তৈরী করে বিক্রী করবার ব্যবস্থা করেন ডাঃ চার্লস সউরিয়া (Charles Sauria),—১৮৩১ সালে। কিন্তু তিনি সেটা পেটেণ্ট করে নিতে গাফিলতি করেন বলে তাঁর ফরমূলা নিয়েই ভিয়েনা আর ডার্ম্মস্টাতে দিয়াশলাই তৈরী হতে থাকে। শোনা যায় এঁদের সকলের আগে 'হাঙ্কভিসগড্‌ফ্রে' বলে এক বৈজ্ঞানিক ১৬৮০ সালে নাকি দিয়াশলাই তৈরী করার চেষ্টা করেন—তবে তার কোন উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না।

'টকি' কে আবিষ্কার করেন ? সর্ব্বপ্রথম সবাক চিত্র কি ?

সবাক চিত্র বিশেষ কোন একজন বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার নয়। 'বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরী'র চেষ্টায় অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক একসঙ্গে গবেষণা করে সবাক চিত্র তোলার পন্থা আবিষ্কার করেন—১৯২৬ সালে 'Don Juan'

বলে একটি ছবিতে খালি বাজনার আওয়াজ শোনানো সম্ভব হয়, এবং এর পরের বছর 'The Jazz Singer' বলে ছবিতে নাচ গান বাজনা সবই শোনানো হয়েছিল। এই ছবিটিই পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম সবাক ছবি।

সিনেরামা (Cinerama) পর্দায় সিনেমা দেখাবার পন্থা কে আবিষ্কার করেন ?

'সিনেরামা' বা বাঁকানো পর্দায় ছবি দেখাবার উপায় আবিষ্কার করেন আমেরিকার বৈজ্ঞানিক ফ্রেড ওয়ালার (Fred waller) ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে। এর থেকেই আরও উন্নত উপায়ে ছবি দেখানোর ব্যবস্থা হলো 'সিনেমাস্কোপে' ঐ ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দেই।

বন্দুক আবিষ্কারের ইতিহাস কি ?

বন্দুকের আবিষ্কার হয় কবে সঠিক বলা যায় না, তবে পঞ্চদশ শতাব্দীতে বন্দুকের আদিপুরুষ 'চোঙা' বন্দুকের যে চলন ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে বর্ত্তমানে বন্দুকের যে উন্নতি, তা ধরা যেতে পারে—স্কটল্যাণ্ডের পাদরী ফরসাইথ (Forsyth) ১৮০৭ সালে যে বন্দুক তৈরী ক'রে পেটেণ্ট করে নেন, তার পর থেকে। এর কলকব্জা অনেকটা আজকালকার বন্দুকের মতই ছিল। তবে তাতে চকমকি পাথরের সাহায্যে বারুদে আগুন লাগানো হতো। 'রিভলবার' বা ছোট আকারের বন্দুক আবিষ্কার করেন 'স্যামুয়েল কোল্ট' (Colt).

'টাইপরাইটার' যন্ত্র কবে আবিষ্কৃত হয় ?

সর্ব্বপ্রথম ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের 'হেনরী মিল' বলে এক ইঞ্জিনীয়ার 'টাইপরাইটার' যন্ত্র তৈরী ক'রে পেটেণ্ট স্বত্ব নেন, তবে তিনি তাঁর কল্পিত 'কল'টি বাজারে বার করতে পারেন নি। তারপর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কোপেন-হেগেনের 'জেকব পিপার্স' আর আমেরিকার তিনজন বৈজ্ঞানিক—(১) কার্লো গ্লিডেন, (২) সি, এল, শোল্স্ এবং (৩) স্যামুয়েল স্যুল এই চারজনেই চার রকমের টাইপরাইটিং কল তৈরী করেন। কিন্তু ১৮৭৪ সালে নিউ

ইয়র্কের 'রেমিংটন' (F. Remington & Son) বলে এক বন্দুক ব্যবসায়ী কোম্পানী মিষ্টার সি, এল, শোলস্-এর (C. L. Sholes) তৈরী মডেলের অনুকরণে এই যন্ত্র তৈরী করে বাজারে চালু করেন।

ক্লোরোফর্মের আবিষ্কার কে করেন ?

ক্লোরোফর্মের আবিষ্কার করেন একই সঙ্গে দুইজন বৈজ্ঞানিক, একজনের নাম ইউজিন সুবেইরাম, আর একজন হচ্ছেন ব্যারন লীবিগ, সেটা হলো ১৮৩১ সালের কথা ; কিন্তু ওটাকে চিকিৎসার কাজে সর্ব্বপ্রথম স্যার জেমস্-সিম্প্‌সনই লাগান। এই ক্লোরোফর্মের সাহায্যে মানুষকে অজ্ঞান করিয়ে অস্ত্রোপচারের মেলাই সুবিধে করে দিয়ে তিনি জগতে অমর কীর্ত্তি রেখে গেছেন। ক্লোরোফর্ম জিনিসটা তৈরী হয় কার্ব্বন, হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন এই কটা জিনিস মিশিয়ে।

'মাইক্রোফোন' কে আবিষ্কার করেন ?

'মাইক্রোফোন' আবিষ্কার করেন 'ডি, ই, হিউয়েস (D. E. Hughes) ১৮৭৮ সালে। অবিশ্যি এই মাইক্রোফোন আবিষ্কারের মূলে ছিল, আল্‌ফ্রেড গ্রাহাম বেলের আবিষ্কৃত টেলিফোনের রিসিভার যন্ত্রটি। এমিলি বার্লিনারকেও কেউ কেউ বলেন মাইক্রোফোনের আবিষ্কারক।

বাইসাইকেল কে আবিষ্কার করেন ও কবে আবিষ্কৃত হয় ?

বাইসাইকেল প্রথম তৈরী করেন একজন জার্ম্মান, নাম তাঁর কার্লভন্ ড্রেইস, সেটা হলো ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের কথা। এই বাইসাইকেল এখনকার বাইসাইকেলের মতোই দু'চাকাওয়ালা ছিল বটে, তবে তাতে চড়ে বসে—পা দিয়ে টিপে ঠেলে গাড়ী চালাতে হোত—প্যাডেলের জোরে সে গাড়ী চলতো না। তারপর ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বাইসাইকেলকে উন্নত ধরণের করে তৈরী করলেন স্কটল্যাণ্ডের 'ম্যাকমিলার কির্কপ্যাট্রিক', কিন্তু তোমরা এখন যে ধরনের প্যাডেলে চলা বাইসাইকেলে চড়ো, তা তৈরী করেন সর্ব্বপ্রথম কভেন্ট্রি শহরের 'জেমস্ কেম্‌প স্টারলী'—১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে।

কামান আবিষ্কারের গোড়ার কথা কি?

কামান কে সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন তা' জানা যায় না। তবে ১৩৩৮ খৃঃ অব্দে কামান প্রথমে নৌযুদ্ধের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয় বলা জানা যায়। ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে রাজা চতুর্থ হেনরীর রাজত্বের পুরানো নথি-পত্তরেও কামানের নাম পাওয়া যায়। বর্ত্তমানের মেসিনগান প্রথম তৈরী করেন 'গ্যাটালিং।'

'মনোটাইপ' বলে টাইপ ঢালাইয়ের যন্ত্র আবিষ্কার করেন কে?

'মনোটাইপ মেশিন' বলে ছাপাখানার অক্ষর ঢালাইয়ের কলটা আবিষ্কার করেন ওয়াশিংটনের 'পেন্‌সন অফিসে'র এক কেরানি। তাঁর নাম 'ট্যালবার্ট ল্যান্‌সটন' (Talbert Lanston)—সেটা হলো ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে।

'লাইনোটাইপ' মেসিন কবে আবিষ্কৃত হয়?

লাইনোটাইপ (Linotype) আবিষ্কার করেন অট্‌মার মার্জ্জেন্‌থেলার (Ottmer Mergentheler). এঁর তৈরী প্রথম লাইনোটাইপ মেসিন ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন পত্রিকার ছাপাখানার কাজে লাগানো হয়।

সাবমেরিন আবিষ্কারের গোড়ার ইতিহাস কি?

সাবমেরিনের ইতিহাস শুরু হয় ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে, তখন 'ড্রেবেল' নামে এক ওলন্দাজ নাবিক রাজা প্রথম জেম্‌সের দরবারে চাকরী করতেন—তিনিই একটি দাঁড় টানা ডুবো জাহাজ তৈরী করেন—যেটি টেম্‌স নদীতে ১২ থেকে ১৫ ফুট জলের নীচে ডুবে চলতো। বর্ত্তমানের সাবমেরিন তারই বংশধর। তারপর ১৬৫২ সালে ফ্রান্সের 'লে-স' (Le Son) কাঠের সাবমেরিন তৈরী করেন। পরে কুশনেল, ফুলটন, হল্যাণ্ড প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকরা সাবমেরিনের উন্নতি সাধন করেন। বর্ত্তমানের অতি আধুনিক সাবমেরিনের মূলে আছে বিখ্যাত আমেরিকান বৈজ্ঞানিক 'সাইমন লেকে'র সাধনা।

ট্যাঙ্ক গাড়ীর আবিষ্কার কবে কোথায় কে করেন?

ট্যাঙ্ক গাড়ী আবিষ্কার হয় ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে। ইংলণ্ডের (Mark 1) মার্ক ওয়ান ট্যাঙ্কই প্রথম ট্যাঙ্ক এবং এর আবিষ্কার করেন সুইনটন বলে এক

বৈজ্ঞানিক, তবে জানা যায় লেফ্‌টেন্যাণ্ট ডবলিউ, জি, উইল্‌সন্‌ আর স্যার ডবলিউ টি্‌টন, এবিষয়ে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

টর্পেডোর আবিষ্কার কবে হয় ও কে করেন?

বর্ত্তমানে যে টর্পেডো ব্যবহার করা হয়, তার আবিষ্কার করেন 'রবার্ট হোয়াইট হেড'্‌ বলে একজন ইংরেজ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে।

'থার্ম্মোসফ্লাস্ক' আবিষ্কার করেন কে?

'থার্ম্মোসফ্লাস্ক' আবিষ্কার করেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার জেন্‌স ডিউয়ার। থার্ম্মোসফ্লাস্কের ভেতর যে কাচের বোতলটি দেখো ওটার ভেতর দিকের দেওয়াল আর বাইরের দেওয়ালের মাঝখানটা ফাঁপা এবং বায়ুশূন্য, আর ফাঁপা অংশটির গায়ে পারার প্রলেপ থাকে। তার ফলে এর ভেতর সব জিনিসের গরম ও ঠাণ্ডা ভাবটা বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে।

পৃথিবীর ওজন আবিষ্কার করেন কে?

হেন্‌রী ক্যাভেণ্ডিস (Henry Cavendis) সর্ব্বপ্রথম অঙ্ক কষে ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর ওজন বার করবার চেষ্টা করেন—সেটা ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে। এর পরে জন্‌ হেনরী পয়েন্টিং বলে আর একজন বৈজ্ঞানিক ১২ বৎসর ধরে পরিশ্রম করেন এই পৃথিবীর সঠিক ওজনটি জানবার জন্যে—তিনি নতুন ধরণের ২টি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র তৈরী করেই পৃথিবীর ওজনের গবেষণা চালিয়েছিলেন, তবে তাতে পৃথিবীটাকে চাপাতে হয়নি।

সেফ্‌টিপিন আবিষ্কার করেন কে?

'সেফ্‌টিপিন'-এর পূর্ব্বপুরুষ 'ব্রুচ্'-এর ধরনের জিনিস প্রাচীন কালের বহু ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পাওয়া গেছে। তবে বর্ত্তমানে যে ধরণের 'সেফ্‌টিপিন' তোমরা সচরাচর দেখতে পাও—সেটা আবিষ্কার করেন 'টি উড্‌ওয়ার্ড'—১৮৪২ খৃষ্টাব্দে।

হারমোনিয়ম আবিষ্কারের গোড়ার ইতিহাস কি ?

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনাতে 'অ্যান্টন হাকেন' বলে একজন লোক 'ফিশ-হারমোনিকা' বলে একটি বাজনা তৈরী করেন। সেটি ঠিক বর্ত্তমানের 'হারমোনিয়মের মত দেখতে ছিল না, তবে তাতে বিভিন্ন স্বরে বিভিন্ন 'রীড' লাগিয়ে একটা স্বরের সামঞ্জস্য বা Harmony আনবার ব্যবস্থা ছিল। এর পরে ডবেঁ (Debain) বলে এক ফরাসী বৈজ্ঞানিক ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমানের হারমোনিয়ম ধরনের তৈরী করেন।

গ্রামোফোন আবিষ্কারের ইতিহাস কি ?

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টমাস্ আল্‌ভা এডিসনই সর্ব্বপ্রথম ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মানুষের কথার শব্দ ধরে—'কলে কথা বলা' শোনান—তাঁর আবিষ্কৃত 'ফোনোগ্রাফ' যন্ত্রে। তাঁর আগে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে 'লিয়ন স্কট' বলে এক বৈজ্ঞানিকও শব্দ ধরে রেকর্ড করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁর চেষ্টা সফল হতে পারেনি। এডিসনের পরে টেলিফোনের আবিষ্কারক 'আল্‌ফ্রেড গ্রাহাম বেল' ও 'এমিলি বার্লিনার' বলে আর দুইজন বৈজ্ঞানিক কথা বলা যন্ত্রকে উন্নত করবার চেষ্টা করেন। 'বার্লিনার' ফোনোগ্রাফের চেয়ে নতুন ধরনের 'কথা বলা কল' তৈরী করেন—সেটাই হলো 'গ্রামোফোন'। এই গ্রামোফোন ও রেকর্ড তৈরী হতে শুরু হয় সর্ব্বপ্রথম আমেরিকায় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে।

সেলাইয়ের কল আবিষ্কার করেন কে ?

প্রথম সেলাইয়ের কল বলতে 'টমাস সেন্ট'-এর কাঠের তৈরী সেলাইয়ের কলটাই বোঝায়। কিন্তু লোহার ও ধাতুর তৈরী সেলাইয়ের কল আবিষ্কার করেন 'থিমোন্নিয়ার' নামে একজন ফরাসী—১৮৩০ খৃষ্টাব্দে। এর পরে ১৮৪৫ সালে 'ইলিয়াস হাও' বলে এক আমেরিকান ইঞ্জিনীয়ার সেলাইয়ের কলের অনেক উন্নতি করেন।

অন্ধদের শিক্ষার জন্য উঁচু অক্ষর প্রথম আবিষ্কার করেন কে ?

অন্ধদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয় সর্ব্বপ্রথম খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে।

'ভ্যালেন্টিন হওয়ি' (Valentine Hawy) বলে এক ফরাসী সঙ্গীতবিদ এই সময় অন্ধদের জন্য উঁচু অক্ষরের (Embossed type) ব্যবস্থা করেন। আমেরিকায় অন্ধদের জন্য প্রথম উঁচু অক্ষরে বই ছাপেন জেম্‌স গ্যাল—১৮২৭ খৃষ্টাব্দে। এর পরেই প্রচলিত হলো বর্ত্তমান 'ব্রেল' প্রণালী (Braile System). এই প্রণালীর আবিষ্কারকের নাম মঁসিয়ে লুই ব্রেল, ইনি জাতিতে ফরাসী ছিলেন এবং নিজেও অন্ধ ছিলেন।

ফাউন্টেনপেন আবিষ্কার করেন কে?

বর্ত্তমানের ফাউণ্টেন পেন আবিষ্কার করেন 'ওয়াটারম্যান' বলে একজন আমেরিকার লোক—সেটা হচ্ছে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু জানা যায় তার ঢের আগে রুশ সম্রাজ্ঞী 'ক্যাথারিন দি গ্রেটে'র নাকি ফাউণ্টেন পেনের মত একটি ঝরণা কলম ছিল।

থার্ম্মোমিটার আবিষ্কার করেন কে?

থার্ম্মোমিটার আবিষ্কার করেন ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়মের এক পদার্থবিদ, তাঁর নাম গ্যাব্রিয়েল ড্যানিয়েল ফারেনহাইট।

চশমা আবিষ্কার কবে কে করেন?

চশমা প্রথম আবিষ্কার করেন ইটালীর ফ্লোরেন্স সহরের এক মঠাধ্যক্ষ,নাম তাঁর আলেকজাণ্ডার দে স্পিনা, ইংরাজি ১২৮৫ সালে। আবার কেউ বলেন ১৩১৭ খৃষ্টাব্দে 'সালভিনো আরমাটি' বলে অপর একজন ফ্লোরেন্সের লোক সর্ব্বপ্রথম চশমা আবিষ্কার করেন।

প্রথম 'স্টীমার' তৈরী করেন কে?

প্রথম স্টীমার বা বাষ্পে-চলা জলযান তৈরী করেন রবার্ট ফুলটন বলে একজন আমেরিকার লোক, সেটা হচ্ছে আনুমানিক ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে। এই জাহাজটির নাম ছিল Clermont, এটি নিউইয়র্ক ও অ্যালবানীর মধ্যে ফেরীর কাজ করতো।

প্রথম টঁ্যাক ঘড়ি তৈরী করেন কে?

প্রথম টঁ্যাক ঘড়ি তৈরী করেন নিউরেমবার্গের এক ঘড়িওয়ালা, নাম হচ্ছে তাঁর 'পিটার হেন্‌লীন'। তবে দেওয়াল ঘড়ি, ক্রোনোমিটার ঘড়ি প্রভৃতির আবিষ্কর্ত্তা হিসাবে 'জন্ হ্যারিসন'কেই ধরা হয়।

পেট্রোলের গ্যাসে চলা মোটর গাড়ীর আবিষ্কার করেন কে?

পেট্রোলের গ্যাসে চলা মোটর গাড়ী ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন গট্‌লিয়ের ডেম্‌লার আর কার্ল বেন্‌জ্—এঁরা দুজনেই জার্মান।

'বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ী'র আবিষ্কার করেন কে?

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ীর আবিষ্কার হয়—আবিষ্কার করেন যিনি, তাঁর নাম, জে, এ, ট্রেন। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ট্রাম লাইন খোলা হয় আমেরিকার নিউইয়র্ক থেকে হার্লেম পর্য্যন্ত।

ভূগোলের নূতন প্রশ্ন

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন নাম কি করে হলো ?

নানা কারণে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন নাম হয়েছে—যেমন ধরো এশিয়া হোল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাদেশ—কিন্তু এর নাম 'এশিয়া' কেন হলো জানো ? অনেকে বলেন সেকালের এই প্রাচ্য ভূখণ্ডে যে সব জাতি বাস করতো—তাদের ভাষায় ঐ 'এশিয়া' শব্দের মানেই হলো 'নবোদিত সূর্য্যের দেশ'। তেমনি ইউরোপ (Europe) কথাটা এসেছে ফিনিসিয়ানদের 'ইরেফ' (Eref) শব্দটির থেকে। 'Eref' মানে পাশ্চাত্য জগত বা অস্তগামী সূর্য্যের দেশ। ১৪৯৭ থেকে ১৫০৪ খৃঃ অব্দের মাঝামাঝি সময়ে—'আমেরিগো ভেসপুচি' (Amerigo Vespucci) বলে এক ফ্লোরেনটাইন নাবিক রটায় যে, সে সমুদ্র যাত্রা করে এসে আমেরিকার উপকূলে নেমেছিল, আসলে ব্যাপারটা ঘটেনি বলেই জানা যায়—তবে তাঁর নামের ঐ 'এমেরিগো' শব্দ থেকেই ঐ নতুন আবিষ্কার করা দেশের নাম নাকি 'আমেরিকা' হয়ে গেছে। 'বৃটেন' নামটা এসেছে Welsh শব্দ Brython থেকে। এমনি ধারা অধিকাংশ দেশের নামের পেছনেই একটু না একটু ইতিহাস বা মানে আছে।

সুয়েজ খাল কবে তৈরী হয় ?

সুয়েজ খালটি কাটা শুরু হয় ১৮৫৯ খৃঃ অব্দের ২৫ এপ্রিল তারিখে। আর খালের পথে যথারীতি ভাবে জাহাজ চলাচল শুরু হয় ১৮৬৯ সালে। খালটি কাটতে খরচ হয়েছিল প্রায় ৪৪ কোটি ফ্রাঙ্ক (ফরাসী মুদ্রা)। এই খাল কাটার ব্যাপারে যিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন তাঁর নাম—ফার্ডিন্যাণ্ড ডি লেসেপ্‌স্।

নদীগুলো সোজা প্রবাহিত না হয়ে কেন এঁকে বেঁকে যায় ?

অধিকাংশ নদীর জন্ম হয় ঝরণা বা ছোট খাটো পাহাড়ী নদী থেকে। নদী যখন তার উৎপত্তির জায়গা থেকে বেরোয়, তখন সে মাটি কেটে সোজাই

প্রবাহিত হয়, কিন্তু যত দূর যায় ততই ক্রমশঃ জলটা বেড়ে যায়, এবং নদীর গভীরতার সঙ্গে নদীর ধারাটাও ক্রমশঃ চওড়া হয়ে যায়—কাজেই তখন নদী হয়ে ওঠে উদ্দাম—স্রোতও যায় বেড়ে। তখন সে পথের মাটিকে সরিয়ে প্রবাহের রাস্তা করে নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু কোথাও উঁচু কোথাও নীচু নদীর পাড়ের মাটি তো সব জায়গায় সমান নয়—কোথাও শক্ত, কোথাও নরম, কোথাও বা বেলে মাটি, কোথাও এঁটেল মাটি—কাজেই যখন নদী তার চলার পথে একদিকে বাধা পায়, তখনই অপরদিকের নরম মাটি ভেঙে নীচু পথ বেয়ে রাস্তা করে নেয়। এইভাবে বাধ্য হয়ে তাকে বরাবর তার চলার গতি বদলাতে হয়, তাই নদী এঁকে বেঁকেই প্রবাহিত হয়।

সুয়েজ খাল কত চওড়া ? কত লম্বা ? কত গভীর ?

সুয়েজ খালটি সব জায়গায় সমান চওড়া নয়—যেখানে সবচেয়ে কম চওড়া সেখানকার মাপ হচ্ছে ১৪৭ ফুট। খালটি একশো সাড়ে চার মাইল লম্বা। সুয়েজ খালের সবচেয়ে কম গভীরতা হচ্ছে ৩০ ফুট—কিন্তু জায়গায় জায়গায় রীতিমত গভীরতা আছে। জাহাজে করে সুয়েজ খালের গোটা পথটি পার হতে লাগে ১৫ ঘণ্টা সময়।

'চীনের প্রাচীর' কত লম্বা ?

১৯০৮ সালে Dr. Gil চীনের প্রাচীর জরীপ করে চীনের প্রাচীরের মোট মাপ আবিষ্কার করেন। তাঁর হিসাব অনুযায়ী প্রাচীরের মোট দৈর্ঘ্য হচ্ছে ২৫৫০ মাইল, প্রাচীরের গোড়াটা ২৫ফুট চওড়া—ওপরটা ১৫ ফুট চওড়া, খাড়াই ১৫ থেকে ৩০ ফুট পর্য্যন্ত ওঠা নামা করেছে।

মিশরের 'গ্রেট পিরামিড্' কি ? এবং কত বড় ?

'গ্রেট পিরামিড' হচ্ছে মিশরের রাজা 'খুফু' অথবা রাজা চিওপসের সমাধি মন্দির, এটি তৈরী হয় যীশুখৃষ্ট জন্মাবার ২৮০৮ বছর আগে—মিশরের পিরামিডের ভিত্তির মাপই হচ্ছে ৭৫৫ ফুট লম্বা চওড়া। আর উঁচু ৪৮১ ফুট। পিরামিড তৈরী করতে ২৩ লক্ষ টুক্‌রো বড় বড় পাথরের চাঁই লেগেছে।

এবং এর এক একটি পাথরের চাঁইয়ের ওজন প্রায় সত্তর মণ—এটি তৈরী করতে এক লক্ষ লোকের ২০টি বছর সময় লেগেছিল। প্রাচীনকালের সেই বিরাট কীর্তি আজও দাঁড়িয়ে আছে ধরণীর বুকে।

পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন শহর 'আলেক্‌জান্দ্রিয়া' কবে স্থাপিত হয়?

মিশরের প্রাচীন রাজধানী 'আলেক্‌জান্দ্রিয়া' শহর যীশুখৃষ্ট জন্মাবার ৩৩২ বছর আগে—সম্রাট্ 'আলেক্‌জাণ্ডার দি গ্রেট'-এর নির্দ্দেশ অনুযায়ী তৈরী হয়।

পৃথিবীর ছাদ বলতে কোন্ জায়গাটিকে বোঝায়?

ভূগোলে পড়েছ মধ্য এশিয়ার পামির মালভূমিকেই পৃথিবীর ছাদ বলা হয়। কারণ সমুদ্রতট থেকে এই মালভূমি প্রায় ১৩ হাজার ফুট উপর অবস্থিত। কিন্তু পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে যে 'চ্যাঙ-মালভূমি' আছে তা নাকি পামির মালভূমির চেয়েও উঁচুতে অবস্থিত—এবং এই জায়গাটি পৃথিবীর ছাদ নাম পাবার বেশী দাবী রাখে।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় হ্রদ কোন্‌টি?

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় হ্রদ বলতে 'ক্যাস্পিয়ান সাগরটি'কেই বোঝায় —ক্যাস্পিয়ান হ্রদ খুব বড়ো বলেই নাম দেওয়া হয়েছে 'ক্যাস্পিয়ান সাগর'। এই হ্রদ ১ লক্ষ ৭০ হাজার বর্গ মাইল মাপের এক এলাকা জুড়ে বিস্তৃত, এর পরেই বড় হ্রদ হিসাবে নাম করা চলে উত্তর আমেরিকার 'সুপিরিয়র হ্রদ' বা 'Lake Superior', এটির মাপ ৩১৮১০ বর্গ মাইল। সবচেয়ে গভীর হ্রদ হলো, সাইবেরিয়ার 'বৈকাল হ্রদ'—এটি প্রায় ২৩০০ ফুট গভীর। লম্বায় সবচেয়ে বড় হলো আফ্রিকার 'টাঙ্গানিয়েকা হ্রদ'—এটি ৪৫০ মাইল লম্বা।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ছ'টি দ্বীপ কি কি?

অস্ট্রেলিয়াকে আমরা মহাদেশ বলি বটে, কিন্তু ওটি আসলে একটি দ্বীপ ছাড়া কিছুই নয়। এবং অস্ট্রেলিয়াই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় দ্বীপ— তারপরেই গ্রীন্‌ল্যাণ্ড; এটি দেশ বলে পরিচিত হলেও এটিও একটি দ্বীপ—

তৃতীয়টি হচ্ছে 'নিউ গায়েনা' বা 'নিউ গিনী'—চতুর্থটি 'বোর্ণিও'—পঞ্চমটি 'বফিন দ্বীপ'—ষষ্ঠটি 'ম্যাডাগাস্কার' দ্বীপ। পৃথিবীর সমস্ত দ্বীপগুলোর মোট জমির মাপ হচ্ছে ৪০ লক্ষ বর্গ মাইল।

পৃথিবীর কোন্ মহাসাগর কত গভীর?

প্রশান্ত মহাসাগরই সবচেয়ে গভীর মহাসাগর, জাপান আর ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মাঝামাঝি মিণ্ডানাও বলে জায়গায় এই মহাসাগরের একটি অংশ সবচেয়ে গভীর বলে জানা গেছে,—এই অংশটি ৩৫৪১০ ফুট গভীর, অর্থাৎ এখানটিতে হিমালয় পাহাড়কে বেমালুম ডুবিয়ে রাখা যায়। আটলান্টিক মহাসাগরের 'পুয়ের্ত্তো রিকো' বলে জায়গাটিই গভীরতম বলে প্রমাণিত হয়েছে, সেখানটা নাকি ২৭৯৬২ ফুট গভীর। ভারত মহাসাগরের 'সুণ্ডা দ্বীপপুঞ্জে'র কাছাকাছি জায়গাটি সবচেয়ে গভীর, সেখানের গভীরতা হচ্ছে ২২৯৬৮ ফুট। উত্তর মহাসাগরের গভীরতম জায়গাটি ১৩৯০২ ফুট গভীর।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু জলপ্রপাত কোন্‌টি?

১৯৩৮ সালে আমেরিকান বৈমানিক মিঃ জে. এঞ্জেল—ভেনিজুয়েলা প্রদেশের 'ক্যারনি' এলাকায় বিমান দুর্ঘটনায় পড়েন। যাই হোক তিনি প্রাণে বেঁচে যান। ঐ জনহীন জায়গায় পথ চলতে চলতে তিনি 'ভেনিজুয়েলার' বিরাট জলপ্রপাতটি আবিষ্কার করেন। জলপ্রপাতটিতে প্রায় এক মাইল উঁচু থেকে জল পড়ে। এইটিই বর্ত্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু জলপ্রপাত। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে চওড়া জলপ্রপাত হলো নায়েগ্রা জলপ্রপাত। এই জলপ্রপাতের শিখরের জলধারা ৪০০০ ফুট চওড়া।

হিমালয়ের পর্ব্বতমালা কত লম্বা ও কতগুলি গিরিশৃঙ্গ আছে সেখানে?

'হিমালয়' ভারতবর্ষের গৌরব, একথা তোমরা জানো, কারণ হিমালয়ের 'এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গ' (মাউন্ট রাধানাথ শিকদার) পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু গিরিশৃঙ্গ। এই হিমালয় লম্বায় ১৫৬৩ মাইল বিস্তৃত এবং এর অসংখ্য

গিরিশৃঙ্গকে গণনা করে শেষ করা যায় না। তবে জানা গেছে হিমালয়ের অন্ততঃ পঞ্চাশটি গিরিশৃঙ্গ ২৫০০০ ফুটেরও বেশী উঁচু এবং এই সব শৃঙ্গে অভিযান করা এরকম অসম্ভব বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে।

কোন্ শহরে স্থলপথের চেয়ে জলপথ বেশী ?

এমন শহরও আছে পৃথিবীতে, যেখানে রাস্তার বদলে চারিদিকে খালি খাল কেটে রাখা হয়েছে, সেটি হচ্ছে 'ভিনিস' শহর। এখানকার লোক গাড়িতে না চড়ে 'গণ্ডোলা' বলে এরকম নৌকা চ'ড়ে এখানে ওখানে যাওয়া আসা করে। খালগুলোর ওপরে কোথাও কোথাও পুল আছে। সেগুলো মারফৎ হাঁটা পথ কিছু কিছু পাওয়া যায়।

কোন্ নদীতে একটিও মাছ পাওয়া যায় না ?

প্যালেস্টাইনের 'জোর্ডান' নদীতে একটিও মাছ পাওয়া যায় না—এটি খৃষ্টানদের কাছে খুব 'পবিত্র নদী' বলেই গণ্য ; কারণ যীশুখৃষ্টকে এই নদীর জলে স্নান করিয়ে 'ব্যাপটাইজ্ড্' করা হয়েছিল বলে খৃষ্টানরা বিশ্বাস করেন। এই নদীতে মাছ বাঁচে না, তার কারণ এর জলের সঙ্গে 'ডেড্ সী'-এর (Dead sea) জলের সংযোগ আছে। এই 'ডেড্সী'র জলে 'পটাস্' ও 'ক্ষার' প্রচুর কাজেই সেখানে কোন প্রাণী বাঁচতে পারে না। তাই তার নাম 'ডেড্ সী' (Dead sea).

সবচেয়ে অগভীর সাগর কোন্‌টি ?

পারস্য উপসাগরের গভীরতা সবচেয়ে কম—গড়পড়তা হিসাবে দেখা গেছে যে এই সাগরের গভীরতা হচ্ছে মাত্র ৮৪ ফুট।

কোন্‌দেশে রাত্রে রামধনু দেখা যায় ?

হাওয়াই দ্বীপে রাত্রে রামধনু দেখা যায় বলে শোনা যায়।

পৃথিবীর কোন্ অনুর্ব্বর দেশ থেকে অন্যদেশের উর্ব্বরতা বাড়াবার উপযোগী প্রচুর সার পাওয়া যায় ?

আমেরিকার চিলি প্রদেশে বৃষ্টি হয় না বললেই চলে - তাই সে দেশটি

একেবারে অনুর্ব্বর—কিন্তু এই প্রদেশের মাটি থেকে 'সোডিয়াম নাইট্রেট' বলে এক রকমের খুব ভাল 'সার' তৈরী হয়ে সারা পৃথিবীতে রপ্তানী হয়।

কোন্ সমুদ্রের জল সবচেয়ে স্বচ্ছ, কিন্তু জাহাজ চলাচল সেখানে সম্ভব নয়?

উত্তর আটলান্টিক অঞ্চলের যে অংশটিকে 'সারগাসো সাগর' বলা হয় সেখানকার জল সব থেকে স্বচ্ছ। এই সমুদ্রের জলে একটা ছয় ফুট সাড়ে দশ ইঞ্চি চাকৃতি ডুবিয়ে দেখা গেছে যে, ৩১৬ ফুট জলের নীচে পর্য্যন্ত ডুবিয়ে ওপর থেকে সেটা দেখা যায়—এই 'সারগাসো' সাগরের আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এই সমুদ্রের জলে এত বেশী জলজ গাছপালা ও শেওলা জন্মায় যে জাহাজ চলাচলের পক্ষে সেখানটা মোটেই উপযুক্ত নয়।

লোহিত সাগরের জল কি লাল? তার ও-নাম হলো কেন?

লোহিত সাগরের জলটা আসলে লালরঙের নয়। তবে লোহিত সাগরের জলের তলায় 'প্রবাল' কীটেরা বাসা করে প্রবাল দ্বীপ গড়ে তোলে—সেগুলো লালরঙের হয়। তাছাড়া লোহিত সাগরের জলে (Algae) 'অ্যাল্‌গি' বলে একরকম সূক্ষ্ম শ্যাওলা বা জলজ উদ্ভিদ অনবরতই ভেসে বেড়ায়; তাই দূর থেকে জলটাকে মাঝে মাঝে লাল দেখায়—আর তাই তার নাম হয়েছে লোহিত সাগর। আসলে এই সাগরের জলও নীল।

কোন্ সমুদ্রের জল সবুজ দেখায়?

উত্তর সাগরের (North sea) জল একেবারে খাঁটি সবুজ রঙের বলেই মনে হয়। তবে যখন মেঘ করে তখন সবুজের বদলে উত্তর সাগরের জল ধূসর রঙের বলেই মনে হয়।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ঘূর্ণাবর্ত্ত কোথায়?

নরওয়ের উত্তরে ও লাফোটেন দ্বীপপুঞ্জের (Lafoten Isles) দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে 'মেল্‌স্ট্রম' (Maelstrom) বলে যে ঘূর্ণাবর্ত্ত আছে সেইটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় 'ঘূর্ণাবর্ত্ত'। সিসিলি ও ইটালির মাঝামাঝি

জায়গায় 'ক্যারিব্‌ডিস্' (Charybdis) বলে যে ঘূর্ণাবর্ত আছে, সেটিও কম বিখ্যাত নয়।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ঠাণ্ডা পড়ে কোন্ জায়গাতে ?

এর জবাবে অনেকেই হয়তো বলে বসবে উত্তর দক্ষিণ মেরুর শেষপ্রান্তে কোন্ জায়গাতে—কিন্তু তা ঠিক নয়। এ জায়গাটি আছে সাইবেরিয়াতে 'ইয়াকুতস্ক' শহর থেকে ৪০০ মাইল দূরে; জায়গাটির নাম 'ভেরখোইয়ান্‌স্ক' (Verkhoyansk). দেখা গেছে এখানে আবহাওয়ার তাপ শীতের দিনে শূন্য ডিগ্রীর থেকে ৯০ ডিগ্রী নীচে থাকে।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে গরম জায়গা কি ?

১৯১৩ সালের ১০ই জুলাই দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ার গ্রীণল্যাণ্ড র‍্যাঞ্চ বলে জায়গাটিতে ছায়ার নীচে তাপমান যন্ত্র রেখে দেখা হয়েছে সেখানকার উত্তাপ ১৩৪ ডিগ্রী ফারেনহাইট। বৈজ্ঞানিকরা বলেন পৃথিবীর মধ্যে ঐ জায়গাটিতেই সবচেয়ে বেশী উত্তাপ উঠেছে। এই জায়গাটি সমুদ্র তট (Sea level) থেকে ১৭৯ ফুট নীচে।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শুকনো জায়গার নাম কি ?

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শুকনো জায়গা হলো সুদানের রাজধানী খার্টুম শহর—এখানের বাতাসে জলকণা মাত্র শতকরা ২৮ ভাগ।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে স্যাঁৎসেঁতে জায়গা কোন্‌টি ?

পশ্চিম আফ্রিকার ক্যামেরুন পাহাড়ের পাদদেশে যে জায়গাটি, সেইটি সব থেকে স্যাঁৎসেঁতে জায়গা। সেখানের বাতাসে শতকরা ৯৩ ভাগ জলকণা থাকে।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মেঘাচ্ছন্ন ও মেঘমুক্ত জায়গা কোন্‌টি ?

রুশ দেশের কোলা উপত্যকার (Kola Peninsula) উপরের আকাশের দশ ভাগের নয় ভাগ সবসময়েই মেঘে ঢাকা থাকে। সেখানে নীল আকাশ কদাচিৎ কখনও দেখা যায়। এর ঠিক উল্টো ব্যাপার ঘটে চিলি প্রদেশের

ক্যালামা (Calama) শহরের উপরের আকাশে—সেখানে আকাশ সব সময়েই পরিষ্কার নীল ; মেঘের দেখা সেখানে মেলা ভার। সেইজন্যে গ্রহ-নক্ষত্র দেখবার জন্য ১৯৩৫ সালে সেখানেই মস্ত এক মানমন্দির (Observatory) তৈরী করা হয়েছে।

কোন্ দেশে বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৩৩৬ দিনই বৃষ্টি পড়ে?

প্রশান্ত মহাসাগরের মার্শালুস্ দ্বীপপুঞ্জের জালুয়িট দ্বীপে গড়পড়তা বছরের ৩৩৬ দিনই বৃষ্টি পড়ে। ওদিকে ঠিক এর উল্টো ব্যবস্থা নীল নদের উপকূলে ওয়াদি হাইফা বলে জায়গাটিতে—সেখানে গড়পড়তা দশ বছরের মধ্যে একদিন এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয় না। পশ্চিম আফ্রিকার ভার্দ্দি অন্তরীপের (Cape Verde) দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপে ৬ বছরে হয়তো মাত্র একটি দিন বৃষ্টি পড়ে।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাঁচটি নদীর নাম কি? কোন্‌টি কত লম্বা ও কোথায় গিয়ে পড়েছে?

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় নদী হলো আমেরিকার 'অ্যামাজন নদী', আটলাণ্টিক মহাসাগরে পড়েছে—লম্বা ৪০০০ মাইল। মিশরের 'নীল নদ', ভূমধ্যসাগরে পড়েছে—লম্বা ৩৫০০ মাইল। ইউরোপের 'ইয়েন্‌স্ নদী', পড়েছে উত্তর মহাসাগরে—৩২০০ মাইল। চীনের 'ইয়াংসী নদী', মিশেছে গিয়ে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে- লম্বা ৩১৬০ মাইল। আফ্রিকার 'কঙ্গো নদী' পড়েছে আটলাণ্টিক মহাসাগরে—লম্বা ৩০০০ মাইল। তবে কেউ কেউ আমেরিকার 'মিসৌরী' ও 'মিসিসিপি' এই দুটি নদীকে একসঙ্গে যুক্ত করে বলেন যে ওটাই পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘ নদীপথ—এ-দুটি নদীর এক সঙ্গে মাপ হচ্ছে ৪২০০ মাইল।

কোন্ দ্বীপের একদিকে বৃষ্টি হয় অন্যদিকে হয় না?

আটলাণ্টিক মহাসাগরে 'ওয়েস্ট ইণ্ডিজ'-এর অন্তর্গত পোর্টোরিকা দ্বীপের মাঝামাঝি এক বিরাট পর্ব্বতশ্রেণী থাকায় সেখানে বৃষ্টির উপযোগী মেঘ এক-

দিক থেকে অন্যদিকে নাকি যেতেই পারে না—তাই সেখানে একদিকেই বৃষ্টি হয়—অন্য দিকে বৃষ্টি হয় না।

পৃথিবীর কোথায় সবচেয়ে গভীর খনি আছে ?

জানা যায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া প্রদেশে একটি খনি আছে যার গভীরতা হচ্ছে ৭৫০০ ফুট। অর্থাৎ প্রায় দেড় মাইলের মত খাদ।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় তিনটি মরুভূমি কি ? কোন্‌টি কত বড় ?

সাহারা মরুভূমিই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মরুভূমি (২০ লক্ষ বর্গমাইল)। এর পরেই দক্ষিণ আমেরিকার প্রেইরি জাতীয় মরুভূমি (১০ লক্ষ ৫০ হাজার বর্গমাইল)। তৃতীয় হচ্ছে গোবি মরুভূমি (৩ লক্ষ বর্গমাইল)।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাঁচটি আগ্নেয়গিরি কি ? কোন্‌টি কত উঁচু ও কোথায় আছে ?

আগ্নেয়গিরি	কত ফুট উঁচু ?	কোথায় আছে ?
১। কোটাপ্যাক্সী	১৯৪৮৮	ইকুয়েডার প্রদেশ
২। স্যাঙ্গে	১৭৪৬৪	ইকুয়েডার প্রদেশ
৩। ইরেবাস	১৩৩০০	উত্তর মেরু প্রদেশ
৪। মৌনালোয়া	১২৬৭৫	হাওয়াই দ্বীপ
৫। ফুজিয়ামা	১২৩৯৫	জাপান

কোন্ হ্রদ পাহাড়ের উচ্চতম চূড়ায় অবস্থিত ?

১৯৩৩ সালে যে সমস্ত বৃটিশ বৈমানিক এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গের উপর দিয়ে উড়ে যেতে সক্ষম হন, তাঁরাই প্রথম দেখতে পান এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গের উপরে একটি হ্রদ আছে—তবে সেখানে যাওয়ার পথ এখনও আবিষ্কার হয়নি। এত উঁচুতে আর কোথাও হ্রদ নেই। এর পরেই দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া প্রদেশের পাহাড়ের চূড়ায় সাড়ে বার হাজার ফুট ওপরে লেক 'টিটিকাকা' (Lake Titicaca) বলে যে হ্রদ আছে সেইটি।

ইতিহাসের খুঁটিনাটি

ভারতবর্ষে 'ইতিহাস' লেখা কবে থেকে হয়েছে?

ভারতের ইতিহাসের বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি বহু প্রকার গ্রন্থের মারফৎ হিন্দুদের জ্ঞান ভাণ্ডারের বহু পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সত্যিকারের'ইতিহাস' বলতে যে জিনিসটি বোঝায় সেটি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে তেমন ভাল কোথাও পাওয়া না গেলেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। বাক্‌পতিরাজের 'গৌড়বহ', পদ্মগুপ্তের 'নবসাহসাঙ্কচরিত', বাণভট্টের 'হর্ষ চরিত', বিহ্লনের 'বিক্রমাঙ্কদেব চরিত', জহ্লনের 'সোমপালবিলাস', হেমচন্দ্রের 'কুমারপাল চরিত', সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' ও কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিনী' প্রভৃতি ইতিহাসকে ভিত্তি করেই কাব্যের আকারে লিখিত হয়। কিন্তু মুসলমানেরা ভারতে আসার পরই ভারতের সাহিত্যের 'ইতিহাস' শাখাকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। মিনাহ্‌জুদ্দিন এক ইতিহাস লেখেন, তাতে তিনি ভারতের মুসলমান শাসনের গোড়া থেকে নাসিরুদ্দিনের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত যা যা ঘটেছিল তা লিখে যান। তাঁর লেখা এই ইতিহাসের নাম'তকৃতি ঈ-নাসিরী।' মিনাহ্‌জুদ্দিন যে পর্য্যন্ত লিখে যান, তারপর থেকে লেখা শুরু করেন, জিয়াউদ্দীন বারনি বলে এক ঐতিহাসিক—তিনি ফিরোজশা তোগলকের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা লিখে যান। মোগল সম্রাটদের আমলে ফেরিস্তা, আবুল ফজল ও মহম্মদ হাকিম বলে তিনজন বিখ্যাত ঐতিহাসিকের পরিচয় পাওয়া যায়। এই আবুল ফজল, আকবরের রাজত্বকালের সমস্ত বর্ণনা দিয়ে দুইখানি বই লিখে যান—এ দু'খানি বইয়ের নাম 'আইন-ই-আকবরী', ও 'আকবরনামা'। পাশ্চাত্য মতে ইতিহাস বলতে যা বোঝায়,—পৃথিবীতে সেটি সকলের আগে সৃষ্টি করেন 'হেরোডটাস্' বলে এক গ্রীক ঐতিহাসিক। যীশুখৃষ্ট জন্মাবার সাড়ে চারশো বছর আগে তিনি এশিয়া মাইনর, মিশর ও সিরিয়া পর্য্যটন করেন এবং বৃদ্ধবয়সে তারই বিবরণী দিয়ে প্রথম 'ইতিহাস' লেখেন।

আকবরের সভায় 'নবরত্ন' বল্‌তে কাদের বোঝায় ?

আকবর নিজে গুণী ও বিদ্বান্ ছিলেন, তিনি তাঁর রাজসভায় তাই ভারতের সম-সাময়িক নয়জন গুণীকে স্থান দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। সে নয়জন গুণী হচ্ছেন (১) টোডরমল্ল (২) আবুল ফজল (৩) ফৈজী (৪) বীরবল (৫) মানসিংহ (৬) তানসেন (৭) হাকিম হুসেন (৮) মোল্লা দোপেয়াজা (৯) আবুল কাদের বদায়ুনী।

ভারতের 'সিপাহী-বিদ্রোহ' প্রথম কবে, কেন ও কোথায় হয় ?

'সিপাহী-বিদ্রোহ' বলতে লোকে সাধারণতঃ বলে থাকে ১৮৫৭ সালের মহা-বিপ্লবের কথা, কিন্তু ২৪ পরগণা জেলার বারাকপুর সেনানিবাসের সৈন্যেরাই প্রথম বিদ্রোহী হয়ে উঠে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে। ব্রহ্মযুদ্ধে একদল ভারতীয় সৈন্যকে চট্টগ্রাম ও আরাকানে পাঠানো হয়। এই ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে তখনই ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে গুজব রটে যায় যে ব্রহ্মযুদ্ধে যোগ দেবার জন্য সিপাহীদের জাহাজে করে 'কালাপানি' (বঙ্গোপসাগর) পার করা হবে। তখনকার দিনে 'কালাপানি' পার হলেই জাত যেত—কাজেই এই খবরটি বারাকপুরের সেনানিবাসে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে তারা খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং ১৮২৪ সালের ৩০ অক্টোবর রাত্রে প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ করে। কিন্তু বন্দুকের ও কামানের গুলিতে বিদ্রোহীদের মধ্যে অনেকেই সেই রাত্রে প্রাণ হারায় এবং বিদ্রোহের নায়কদের ফাঁসি দেওয়া হয়। ফলে ১৮৫৭ সালের মহা-বিপ্লবের মত সৈন্যদের বিদ্রোহের কথা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। তাই সে কথা আমরা অনেকেই জানিও না।

পলাশীর যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনা কেন ? পলাশী কোথায় ?

কলিকাতা থেকে ৯৩ মাইল দূরে পূর্ব্বাঞ্চল রেলপথে এই 'পলাশী' স্টেশন। স্টেশন থেকে দু'মাইল দূরেই 'পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র'—১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন বৃহস্পতিবার এইখানে বাঙালীর শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার

সেনা-বাহিনীর সঙ্গে ক্লাইভের অধিনায়কতায় ইংরেজ সৈন্যদের যুদ্ধ হয়—এবং এই যুদ্ধে জয়লাভ করেই ইংরেজ বাঙলায় তাদের আধিপত্য গড়ে তোলে। এ যুদ্ধে নবাবের সাড়ে চার হাজার সৈন্য—সেনাপতি মীরজাফর ও রায়-দুর্লভের অধীনে থাকায়—তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে যুদ্ধক্ষেত্রে নিশ্চেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল—কারণ মীরজাফর ও রায়দুর্লভ প্রভৃতি বহু বিশ্বাসঘাতক গোপনে ইংরেজের পক্ষ নিয়ে বাঙলা তথা ভারতকে ইংরেজের হাতে তুলে দিয়েছিল। এই পলাশীর যুদ্ধে নবাবের পক্ষ নিয়ে যাঁরা প্রাণ দিয়ে লড়াই করে গেছেন, তার মধ্যে নবাবের ফরাসী সেনাপতি সেণ্ট ফ্রায়াস্, সেনাপতি মীরমদন এবং সেনাপতি রাজা মোহনলালের নাম অমর হয়ে আছে—পলাশীর মাঠে আজও তাই দেশভক্ত হিন্দু মুসলমান শুধু দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলতে যায়। পলাশীতে যে জায়গাটিতে যুদ্ধ হয়েছিল সেই আমবাগান আজ গঙ্গার চরে পরিণত।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সবচেয়ে 'বড় আদর্শ' রেখে গেছেন কোন্ বীর ?

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সম্রাট্ অশোক, প্রতাপসিংহ ও শিবাজীর নাম স্বর্ণাক্ষরে চিরদিন লেখা থাকবে। বিশেষ করে শিবাজীর চরিত্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব আদর্শ রেখে গেছে। কিশোর জীবনে মাওয়ালীদের সর্দ্দার ছিলেন তিনি—তিনি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সঙ্ঘশক্তি গঠন করে মারাঠা জাতিকে জাগিয়েছিলেন—শুধু তাই নয় সেকালের সেই মুসলমান সম্রাট্দের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হিন্দুরাজ্যগুলিকে প্রাণশক্তি জুগিয়েছিলেন। তারপর ১৬৭৬ সালে স্বাধীন রাজা বলে নিজেকে ঘোষণা করে তিনি রায়-গড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু নামে 'রাজা' হলেও কাজে রইলেন আদর্শ সৈনিক ও কর্ম্মী—রাজ্যের ও রাজার আড়ম্বর তাঁর জীবনে ছিল না। বিদেশীদের হাত থেকে 'ধর্ম্ম ও দেশ'কে প্রাণপণে রক্ষা করা যে প্রত্যেক মানুষের ধর্ম্ম এ কথা তিনিই সর্ব্বপ্রথম শিখিয়ে যান ভারতবাসীকে। তিনি

রাজা হয়েও তাঁর গুরু রামদাসের দেওয়া 'ভাগোয়া ঝাণ্ডা' বা 'গৈরিক পতাকা'কে কোন দিন পরিত্যাগ করেন নি।

কোন্ হিন্দু রাজা পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে বেঁচে না থেকে আত্মহত্যা করেছিলেন ?

ভাটিন্দার রাজা জয়পাল পেশোয়ারের যুদ্ধে সুলতান মাহমুদের কাছে পরাজিত হন—সুলতান মাহমুদ তাঁকে বন্দী করে মুক্ত করে দেন—কিন্তু জয়পাল এ পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করেন। তিনি নিজ হাতে চিতা সাজিয়ে তারই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন।

ভারতের কোন্ বিখ্যাত সম্রাট্ যুদ্ধের হত্যাকাণ্ডে বিচলিত হয়ে যুদ্ধলিপ্সা ত্যাগ করেন ?

সম্রাট্ অশোক, প্রাচীন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্ ও মহাবীর; কিন্তু কলিঙ্গের যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শনে গিয়ে—যুদ্ধের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ও নৃশংসতা দেখে তিনি যুদ্ধ জয় করার নীতি একেবারে ত্যাগ করেন। এর পর থেকেই তিনি দেশবিদেশে সৎশিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা করে সকলের মন জয় করার চেষ্টা করেন। এককালে অশোকের অনুশাসন বা জ্ঞানের বাণী গোটা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ভারতবর্ষে ইংরাজদের প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে কোন্ কোন্ ব্যক্তি যুদ্ধ-বিগ্রহ ক'রে বিখ্যাত হয়ে আছেন ?

টিপু সুলতান, হায়দার আলি, বাজীরাও পেশোয়া, যশোবন্ত রাও হোলকার, আমীর খাঁ, লাল সিংহ, নানা সাহেব, তাত্যা তোপি, নবাব সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম।

ভারতের কোন্ মুসলমান সম্রাট্ সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান ?

সম্রাট্ হুমায়ুন ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর গ্রন্থাগার থেকে বই পড়ে ফেরবার সময় সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পড়ে গিয়ে আঘাত পান, এবং তাতেই তাঁর মৃত্যু

ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী হাজি বেগম দিল্লীতে তাঁর কবরের ওপর এক বিরাট স্মৃতিমন্দির গড়ে তোলেন—এটি তৈরী করতে ১৬ বছর লেগেছে। এখানে হুমায়ুন এবং তাঁর বংশধরদের বহু লোকের কবর আছে।

সম্রাট্ বাবরের আসল নাম কি?

সম্রাট্ বাবর—'বাবর' নামেই ইতিহাসে পরিচিত, কিন্তু তাঁর আসল নাম হচ্ছে 'জাহিরুদ্দিন মোহাম্মদ'। তিনি ছোটবেলা থেকে খুব দুর্দান্ত আর তেজী ছিলেন বলে তাঁকে 'বাবর' বলেই ডাকা হতো। 'বাবর' শব্দের অর্থ হলো 'সিংহ'।

ভারতের কোন্ মুসলমান সম্রাট্ গোড়ায় সাধারণ সৈনিক ছিলেন?

সম্রাট্ শেরসাহ্ সাসারামের এক ছোটখাটো আফগান জমিদারের ছেলে ছিলেন—কিন্তু নিজের বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তা-বলে একদিন ভারতের সম্রাট্ হতে পেরেছিলেন।

ভারতের কোন্ মুসলমান সম্রাট্—শিল্পী ও সাহিত্যিক ছিলেন?

সম্রাট্ জাহাঙ্গীর কবিতা রচনা করতে ও ছবি আঁকতে জানতেন—এবং দেশের শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সমাদর করতেন। এমন কি তিনি নিজেই তাঁর আত্মজীবনী লিখে রেখে গেছেন। তাই থেকে জানা যায় সম্রাট্ জাহাঙ্গীর অত্যন্ত খেয়ালী ও শৌখিন মানুষ ছিলেন। শোনা যায় তিনি উল্কাপিণ্ডের ধাতু দিয়ে একটি তরবারি তৈরী করেছিলেন।

১৯১৪ সালে ইউরোপের মহাযুদ্ধ কি নিয়ে প্রথম বাধে?

১৯১৪ সালের ২৮শে জুন অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী যুবরাজ 'ফ্রান্সিস্ ফার্ডিন্যাণ্ড' বসনিয়ার সারাজেভো শহরে গ্যাভ্রিলো প্রিন্সিপের হাতে নিহত হন। এই হত্যাকারীর সঙ্গে এমন একদল অস্ট্রিয়া-প্রবাসী সার্ব্বিয়ান লোকের যোগাযোগ ছিল—যারা অস্ট্রিয়ার পরাধীনতার বিরুদ্ধে হিংসা পোষণ করতো এবং সার্ব্বিয়া রাজ্যে তাদের জ্ঞাতিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। কাজেই এই অছিলায় এই ঘটনার ঠিক এক মাস পরেই

১৯১৪ সালের ২৮শে জুলাই অস্ট্রিয়া সার্ব্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে—এই থেকেই ক্রমশঃ ইউরোপের যুদ্ধে দল বাঁধাবাঁধি নিয়ে হৈ চৈ লেগে যায় এবং ক্রমশঃ ব্যাপারটা বড় গোছের হয়ে উঠে মহাযুদ্ধের আকার নেয়।

অষ্টম এডওয়ার্ড কেন রাজ্য ত্যাগ করেন?

সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের মৃত্যুর পর অষ্টম এডওয়ার্ড ১৯৩৬ সালের ২০শে জানুয়ারী ইংলণ্ডের রাজা হন। কিন্তু ঐ বছরের শেষের দিকে তিনি 'মিসেস ওয়ালিস্ সিম্পসন' বলে এক আমেরিকান মহিলাকেবিয়ে করার বাসনা জানান। এ বিবাহে তাঁর রাজ্যসমূহের প্রজা ও অমাত্যদের অমত থাকায় তিনি ১৯৩৬ সালের ১০ই ডিসেম্বর রাজ্য ত্যাগ করে সেই মহিলাকেই বিবাহ করেন।

সিরাজদ্দৌলার বাবার নাম কি?

সিরাজদ্দৌলার বাবার নাম জৈনুদ্দিন,—তিনি হচ্ছেন নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর বড় ভাই হাজি আহম্মদ খাঁর ছোট ছেলে—অর্থাৎ সিরাজদ্দৌলার মা আর বাবা খুড়তুতো-জাঠতুতো ভাই বোন। মুসলমান সমাজে ওরকম বিবাহ চল্তি আছে।

ভারতের কোন্ সম্রাজ্ঞী পুরুষের পোষাক পরে রাজত্ব পরিচালনা করতেন?

ইলতুৎমিসের মেয়ে সম্রাজ্ঞী রিজিয়া যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন—তখনই তিনি নারীর পোষাক ছেড়ে রাজকীয় পুরুষের পোষাক পরেন—এবং এই পুরুষের পোষাক পরেই তিনি প্রতিদিন রাজ-সভায় হাজির হতেন।

পৃথিবীর কোন্ কোন্ রাজা ও রাষ্ট্রপরিচালক স্বেচ্ছায় শাসন ক্ষমতা ত্যাগ করেছিলেন?

৩০৫ খৃষ্টাব্দে—রোম সম্রাট্ ডায়োক্লিসিয়ান, ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে—নেপোলিয়ন, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে—রুশ সম্রাট নিকোলাস, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে—জার্ম্মান-রাজ দ্বিতীয় উইলিয়াম, ১৯৩৬ সালে—ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড, ১৯৪০ সালে—রুমানিয়ার রাজা দ্বিতীয় ক্যারল।

পাঁচ-মিশেলি প্রশ্ন

খবরের কাগজের কোন কোন খবরের তলায় 'রয়টার' লেখা থাকে কেন ?

খবরের কাগজে অনেক খবরের তলায় 'রয়টার' লেখা থাকে ; কারণ পৃথিবীর সবদেশের খবর বিতরণের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান রয়টারের কাছ থেকে এ খবরগুলি পাওয়া যায়—এই প্রতিষ্ঠান যিনি প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর নাম পল্ জুলিয়াস রয়টার। তিনি আগে গরীব কেরাণী ছিলেন, কিন্তু পরে ব্যারন উপাধি পেয়েছিলেন।

'ফুল্‌স্ক্যাপ' কাগজের নাম অমন হলো কেন ?

বাজারের ফুল্‌স্ক্যাপ কাগজের নামটা হচ্ছে foolscap. কথাটা এসেছে এইজন্যে যে, আগেকার দিনে ঠিক ঐ মাপের কাগজে লম্বা চোঙার মত একটা টুপির 'জলছাপ' থাকতো—এ টুপির নাম ছিল fools' cap বা বোকাদের টুপি,—টুপিটা অনেকটা ঐ গাধার টুপির মতই।

বিকেলবেলা থিয়েটার বায়স্কোপে যে 'শো' হয় তাকে 'ম্যাটিনী' শো (Matinee Show) বলে কেন ?

বিকেলবেলা সিনেমার যে শো হয়ে থাকে তাকে Matinee বলা হয় এইজন্যে যে, খৃষ্টানদের গির্জ্জায় উপাসনা করবার বিভিন্ন সময় বাঁধা আছে। রোমান ক্যাথলিকদের গির্জ্জায় এই সাতটি সময়ের নাম হচ্ছে—ম্যাটিনস্, প্রাইম, টিয়েন, সেক্সট্, নোনস, ভেস্পার্স আর কম্‌প্রাইন। ম্যাটিন্‌স্ বলা হয় মাঝ রাতের ও বিকালের দিকে একটা বাঁধা সময়কে। এর থেকেই 'ম্যাটিনী' কথাটা এসেছে।

নোটের ওপর জলছাপ (water-mark) কি করে হয় ?

মোটামুটি ব্যাপারটা হচ্ছে—কাগজের ভিজে মশলা যখন ছাঁচে ফেলে কাগজ তৈরী হয়, তখন ভিজে অবস্থাতেই তারের তৈরী জলছাপের একটা

মার্কা তার উপর চেপে ধরে ছাপা তোলা হয়। কাগজ শুকোলে সেটা স্পষ্ট দেখা যায়, অবশ্য এর জন্য কারিগরী ও কলকৌশলের সাহায্য লাগে।

১লা এপ্রিল লোকে লোককে ঠকিয়ে 'এপ্রিল ফুল' করে কেন এবং এ ব্যবস্থা কে প্রচলন করে?

এসম্বন্ধে নানারকম মত আছে তবে যতদূর জানা যায়, এ ব্যবস্থাটা ফ্রান্স থেকে চলন হয়। আগে ১লা এপ্রিল থেকে বছর গোনা শুরু হোত এবং ফ্রান্সের রাজা চার্লস্ ১৫৬৪ সালে এই ১লা এপ্রিল থেকে বছর গণনার প্রথা পালটিয়ে ১লা জানুয়ারী থেকে বছর গণনার ব্যবস্থা করেন। যেদিন তিনি এই ঘোষণা করেন সেদিন দেশের লোক সবাই খুব খাপ্পা হয়ে ওঠে তাঁর ওপর, কিন্তু পরে যখন জানা গেল যে, এই ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ১লা এপ্রিল রাজাকে যে মহামূল্য ভেট দেবার ব্যবস্থা ছিল, তাও রাজা বন্ধ করে দিয়েছেন, তখন সবাই খুশি হলো। এবং বোকামির জন্য লজ্জিতও হলো। সেই জন্যই ১লা এপ্রিলকে বলা হয় 'বোকাদের দিন' এবং ঐ দিন তাই বোধ হয় বুদ্ধিমানদের ঠকিয়ে বোকা বানাবার চেষ্টা চলে।

ডাক্তাররা প্রেসক্রপসন লেখার আগে R লেখে কেন?

এর জবাবে জেনে রাখো ঐ পেটকাটা R হচ্ছে ল্যাটিন শব্দ 'Receipere' -এর সংক্ষিপ্ত চেহারা। এই শব্দটির মানে হচ্ছে 'লও' বা 'নাও'। অর্থাৎ ওষুধটা তৈরী করার সময় নীচের লেখা 'উপাদানগুলি নাও'—এইটি বোঝানো হয় ঐ একটিমাত্র চিহ্ন দিয়ে।

পাঁউরুটি নামের তাৎপর্য্য কি?

পর্তুগীজ ভাষায় রুটিকে বলা হয় 'পাও' (Pao) আর ফরাসী ভাষায় রুটি হলো 'প্যাঁ' (Pan). পর্তুগীজ আর ফরাসীরা এদেশে ঐ ধরণের রুটির প্রথম প্রচলন করে—তাই ঐ 'প্যাঁ' 'পাও' এর সঙ্গে বাঙলা কথা 'রুটি' মিলে মিশে হয়ে গেছে 'পাঁউরুটি'।

তাসের চার রকম রঙের 'হরতন', 'ইস্কাবন', 'রুইতন', 'চিড়িতন', হলো কেন ?

আমরা এখন যে ধরণের তাস নিয়ে খেলি, এ ধরণের তাসের প্রবর্ত্তন করে পর্ত্তুগীজরা। তাদেরই দেওয়া ঐ রঙগুলির নাম থেকেই বিকৃত হয়ে এসেছে বাঙলা নামগুলি। পর্ত্তুগীজ শব্দ 'Harten' থেকে এসেছে 'হরতন', Ruiten থেকে 'রুইতন', 'Schappen' থেকে 'ইস্কাবন'—তবে 'চিড়িতন' যে রঙটিকে আমরা বলি সেটার পর্ত্তুগীজ নাম হলো 'Klapera'. ঐ 'চিড়িতন' কথাটা অন্য রঙের নামের সঙ্গে মিল রাখার জন্যই বোধ হয় বাঙালীরা করে নিয়েছে।

ঠিকানায় নামের পেছনে Esq. লেখা হয় কেন ?

এর জবাবে বলা চলে ওটা নিছক 'ইংরাজী কায়দা'—ওদের দেশে ঐ রকম লেখার প্রথার পিছনে একটু ইতিহাসও আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, প্রাচীনকালে ইংলণ্ডের নাইটদের (Knight) সঙ্গে সঙ্গে যে সব লোক ঢাল বহন করে নিয়ে যেত তাদের সম্মান করে বলা হোত 'এস্কোয়ার' (Esquire) সেই সম্মানের খেতাব শেষকালে চলন হয়ে গেল ইংলণ্ডের জনসাধারণের মধ্যে। আর তারই নির্লজ্জ অনুকরণ করে আমরাও ঐ Esq. লিখতে শিখলাম।

হাইড্রোজেন বোমা কত ভয়ঙ্কর ?

আমেরিকার প্রথম হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষা করা হয়েছে ১৯৫৬ সালের মে মাসে বিকিনির বলয় দ্বীপে। এই বোমা ফাটানোয় যে আগুনের গোলা জ্বলে উঠেছিল, তার পরিধি ছিল চার মাইল ব্যাপী আর তাতে আলো হয়েছিল পাঁচশো সূর্য্যের সমান। বোঝো তাহলে কত ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

বেতার বিজ্ঞানে কিলোসাইকেল বল্‌তে কি বোঝায় ?

বেতার তরঙ্গের পরিমাপ করা হয় এই কিলোসাইকেলের হিসাবেই। এক কিলো সাইকেল মানে একহাজার শব্দতরঙ্গ—একসেকেণ্ডে যা সঞ্চারিত হয়।

ভাষা ও সাহিত্যের টুকিটাকী

জগতের আদি-সাহিত্য কোন্ ভাষায় সৃষ্টি হয়েছে ?

ইংরাজী বইতে গ্রীক সাহিত্যকে জগতের আদি-সাহিত্য বলে প্রচার করা হয়েছে, কিন্তু বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা অনেকে বলেন ভারতবর্ষেই প্রথম সাহিত্যের জন্ম, কারণ—'মহেন্‌জোদারো' আবিষ্কৃত হওয়ার পর অনেকেই বলেছেন যে ভারতীয় সংস্কৃতি বিশ হাজার বছরের পুরানো—আর যাঁরা সব চেয়ে কম করে হিসেবে ধরেছেন—তাঁরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে ভারতবর্ষের সভ্যতা পাঁচ হাজার বছর আগে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল ও এই থেকেই প্রমাণিত হয়েছে যে যীশুখৃষ্ট জন্মাবার ৩।৪ হাজার বছর আগে বৈদিক ভাষার সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং বলা চলে, স্তুতিরূপে ভারতের ঋষিদের মুখে মুখে যে বেদগণের সৃষ্টি হয়েছিল তাই থেকেই জগতের আদি-সাহিত্যের সৃষ্টি। ঋগ্বেদই হলো প্রাচীনতম সাহিত্য, ঋগ্বেদের ভাষাই প্রাচীনতম আর্য্যভাষা। বেদের পরে এলো উপনিষদ্। তারপর এই বৈদিকভাষা থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত। সংস্কৃত ভাষায় আরও উন্নত ধরণের সাহিত্য হয়ে দেখা দিল রামায়ণ ও মহাভারত। সংস্কৃত সাহিত্যের সমসাময়িক বলা চলে—পারস্য, গ্রীস, রোম, ও চীনের সাহিত্যকে।

জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কোন্ কোন্ ভাষাতে সৃষ্টি হয়েছে ?

সংস্কৃত, গ্রীক, চীনা, আরবী, ফারসী (পারসীক), ল্যাটিন, ইংরেজী, জার্মান এবং আমাদের বাঙলা ভাষাতেই জগতের সবসেরা সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে বলে পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন।

ভারতীয় কোন্ কোন্ সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় থাকা আমাদের দরকার ?

ভারতের বর্ত্তমান সাহিত্য প্রধানতঃ বাঙলা, হিন্দী, গুজরাটী, তামিল, তেলেগু, উর্দ্দু, মারাঠী, উড়িয়া, মালয়ালাম্, আসামী ও কানাড়ী ভাষাকে

বাহন করে গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত ভারতীয় ভাষায় বহু প্রাচীন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে, এবং বর্ত্তমানেও বহু ভালো ভালো গ্রন্থ রচিত হচ্ছে ভারতের সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করবার জন্য। তোমরা যে কোন বিদেশী সাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামাবার আগে ভারতের সাহিত্যকে ভাল করে জানবার ও চেনবার চেষ্টা করবে। ভারতের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের মধ্যে বাঙলা সাহিত্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়েছে।

আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস কি ?

আরবী ভাষা প্রাচীন 'সেমেটীক' ভাষাবর্গের ভিতরেই পড়ে। তবে আরবী সাহিত্যের আদি বলতে যা পাওয়া যায়, তা পঞ্চম শতকের কবিদের রচনা—এই সব কবিতা মুখে মুখেই প্রচারিত হতো। ৭০০ খৃঃ অব্দের আগে কবিতা লেখবার প্রথা আরবী সাহিত্যে ছিল না বলেই জানা যায়। আরব গদ্য সাহিত্যের সবচেয়ে পুরানো নিদর্শন হলো 'পবিত্র কোরাণ'। ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী কোরাণ হচ্ছে আল্লাহের বাণী, এবং স্বর্গীয় দূত জেব্‌রাইল মারফত হজরত মোহম্মদের নবীজীবনের ২৩টি বছর ধরে সাময়িক প্রয়োজন অনুসারে এই বাণী পৃথিবীতে এসেছে। এই কোরাণ তিরিশটি খণ্ডে ও একশো চৌদ্দ অধ্যায়ে ভাগ করা। আরবী সাহিত্যের উন্নতির সূত্রপাত হয় খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতকে। তখন মহামতি মনসুর, হারুন-অল্‌-রসিদ প্রভৃতি খলিফারা সাহিত্যকে পুষ্ট করবার জন্য ধর্ম্মগত ও কবিতা ছাড়াও—সংস্কৃত, সিরিয়াক ও গ্রীক ভাষায় রচিত বহু জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থের অনুবাদ করান। আরব দার্শনিক ও গাণিতিক 'অল কিন্‌দি' গ্রীক লেখক অ্যারিস্তোতলের গ্রন্থ আরবীভাষায় তর্জ্জমা করেন। জগতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আরব্য উপন্যাসে'র নাম তোমরা সকলেই শুনেছ, কিন্তু এই গ্রন্থ আরবী সাহিত্যের সম্পদ কি পারসিক সাহিত্যের সৃষ্টি তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, এই গল্পগুলি ভারতবর্ষ থেকে পারস্যের ভিতর দিয়ে আরবে পৌছায়। কেউ বলেন পারসিক গল্পগ্রন্থ 'হজার আফসান' থেকেই এর উপাদান সংগৃহীত হয়।

কারুর কারুর মতে এই গল্পগুলি একসঙ্গে 'কিতাব অল্‌ফ্‌ লয়লা' নামে আরবীভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

পারসিক সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাস কি?

পারসিক সাহিত্যের প্রাচীন সাহিত্য বলতে বোঝায় যীশুখৃষ্ট জন্মাবার প্রায় ২ হাজার বছর আগে থেকে ২২৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল তাই। তখনকার দিনের কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না বটে, তবে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন 'নিনেভা' (Ninevah) শহর খুঁড়ে যে চিঠিখানি ও ফাইরাস্ দারিয়স্ প্রভৃতি অ্যাকামেনিয় সম্রাট্‌দের তৈরী যে সমস্ত স্মৃতিফলক বেহিশতুন্ ও পার্সিপোলিস প্রভৃতি জায়গায় পাওয়া গেছে সেইগুলিই এই প্রাচীন পারসিক সাহিত্যের নিদর্শন। ২২৬ খৃঃ অব্দে সাসানীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের সময় থেকে ৬২৫ খৃঃ অব্দে মুস্‌লিমদের পারস্য অধিকারের সময় পর্য্যন্ত যে পারসিক সাহিত্য পাওয়া যায়—সেই সাহিত্য সাসানীয় ও পহ্লবী সাহিত্য নামে খ্যাত। আবেস্তা, জিন্দ (আবেস্তার ব্যাখ্যা) ও পাজিন্দ (জিন্দের ব্যাখ্যা) প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থগুলি ছাড়া ঐ যুগের লেখা কোনও গ্রন্থের বড় বিশেষ সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রকৃত পারসিক সাহিত্য বলতে যা বোঝায় তার সৃষ্টি হয় আরবীয় মুসলিমদের পারস্য বিজয়ের পর থেকে—১৯০৫ সালের পারস্য বিপ্লবের আগে পর্য্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে পারসিক সাহিত্যে বহু উন্নতধরণের সাহিত্য-সৃষ্টি দেখা দেয়। এই যুগে কবি, কাব্য ও সাহিত্যের আদর রাজসভায় ছিল বলেই অনেক পারসিক কবিও বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তার মধ্যে দকীকী—প্রথম পারসিক জাতীয় মহাকাব্য 'শাহ-নামাহ' রচনা করবার ভার গ্রহণ করেন; কিন্তু হাজার শ্লোক লেখার পরই, তাঁর এক ক্রীতদাস তাঁকে হত্যা করে। কাজেই মহাকবি ফেরদৌসী তুসি 'শাহ-নামাহ'র বাকিটা রচনা করেন। এই যুগেই পারসিক সাহিত্যের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক-কবি ওমর খৈয়ামের 'রুবাইয়াৎ' রচিত হয়; নীতিবাগীশ কবি শেখ সাদী 'গুলিস্তাঁ' ও 'বুস্তাঁ' রচনা করে সারা জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

পারসিক সাহিত্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি কি ?

ওমর খৈয়ামের—'রুবাইয়াৎ' ; কা-আনীর—'কাসিদা সুবে' ; মৌলানা শেখ জালালুদ্দিন রুমীর—'মসনবী' ; শেখ মুসলহাউদ্দীন সিরাজ সাদীর—'গুলিস্তাঁ' ও 'বুস্তাঁ' ; ফেরদৌসীর—'শাহনামা' ; ফৈজ-ফৈজীর—'কুল্লিয়াৎ,' 'তালিসম হোশ্‌রুবা, ; হাফিজ শেখ সামসুদ্দীন তাব্রিজীর—'দেওয়ানা-ই-হাফিজ' ; সৈয়দ আশ্বাস শুত্তরীর—'মন্না' ও 'সলওয়া' ; উবেয়দুল্লা আল্—উবেয়দী ; আল মুহরাওয়াদীর 'দিওয়ানা' ; আমীর খসরুর—'দিওয়ানা' ; শেখ ফরিদউদ্দীন আত্তারের—'পন্দনামা' ; স্যার মহম্মদ ইক্‌বালের—'পয়ামে মশারিক'।

সংস্কৃত সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি কি কি ?

সংস্কৃত সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির নিখুঁত তালিকা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়—তবে মাত্র কয়েকটি সৃষ্টির নাম এখানে দেওয়া হলো—যা তোমাদের প্রত্যেকেরই জানা উচিত—কারণ জগতের সাহিত্যের জনক যে সংস্কৃত সাহিত্য, তা তোমার দেশের গৌরব ও জাতির গৌরব।

সংস্কৃত গদ্য-সাহিত্য ঃ—দণ্ডীন্ রচিত 'দশকুমার চরিত'। বাণভট্টের 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত'। **সংস্কৃত কাব্য ঃ**—কালিদাস রচিত—'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব', 'মেঘদূত', 'ঋতুসংহার'। ভারবি রচিত—'কিরাতার্জ্জুনীয়'। ভট্টা রচিত—'ভট্টি কাব্য'। ভর্ত্তৃহরি রচিত—'বৈরাগ্য শতক', 'শৃঙ্গার শতক,' 'নীতি শতক'। অশ্বঘোষ রচিত—'বুদ্ধ-চরিত্র'। শ্রীহর্ষ রচিত—'নৈষধীয়'। কহ্লন রচিত—'রাজতরঙ্গিনী'। জয়দেব রচিত—'গীতগোবিন্দ'। সুবন্ধু রচিত—'বাসবদত্তা'। বিহ্লন রচিত—'চৌর পঞ্চাশিকা'। রাজা অমরু রচিত—'অমরু শতক'। হলায়ুধের—'কবিরহস্য'। মাঘের—'শিশুপালবধ'। কবিরাজের—'রাঘবপাণ্ডবীয়'। **সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্য ঃ**—কালিদাস রচিত—'শকুন্তলা', 'বিক্রমোর্ব্বশী', 'মালবিকাগ্নিমিত্র'। শূদ্রক রচিত—'মৃচ্ছকটিক'। ভবভূতি রচিত—'মালতীমাধব', 'মহাবীর চরিত', 'উত্তররাম রচিত'। দিঙনাগ

রচিত—'কুন্দমালা'। বিশাখ দত্ত রচিত—'মুদ্রারাক্ষস'। ভট্টনারায়ণ রচিত 'বেণী সংহার'। ক্ষেমীশ্বর রচিত—'চণ্ডকৌশিক'। দামোদর মিশ্র রচিত—'হনুমান নাটক'। ভাস রচিত—'প্রতিমা নাটক', 'মধ্যম ব্যায়োগ', স্বপ্ন বাসবদত্তা' প্রভৃতি। শ্রীহর্ষ রচিত—'রত্নাবলী', 'প্রিয়দর্শিকা', 'নাগানন্দ'। রাজশেখর রচিত—'বিদ্ধশালভঞ্জিকা', 'কর্পূর মঞ্জরী'। **সংস্কৃত উপকথা ও রূপকথা-সাহিত্য ঃ**—'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'সিংহাসন দ্বাত্রিংশিকা', 'কথাসরিৎসাগর,' 'বৃহৎকথা মঞ্জরী' প্রভৃতি। **সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র ও ব্যাকরণ ঃ**—দণ্ডী রচিত—'কাব্যাদর্শ'। বিশ্বনাথ রচিত—'সাহিত্যদর্শন।' আনন্দবর্দ্ধনের—'ধ্বন্যালোক'। পাণিনির—'অষ্টাধ্যায়ী'। পতঞ্জলি রচিত—'মহাভাষ্য'। ভট্টোজি দীক্ষিতের—'সিদ্ধান্ত কৌমুদী'।

সংস্কৃত বেদের অনুবাদ ও টীকাকার হিসাবে কোন্ কোন্ ইউরোপীয় পণ্ডিত বিশেষ প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন ?

জার্ম্মান পণ্ডিতেরা বেদ সম্বন্ধে বহু গবেষণা করেছেন, তাঁদের মধ্যে লুড্‌ভিগ্, গেল-ডনার ও ওলডেন্‌বার্গ প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। ম্যাক্স-মূলার, উইলসন, গ্রীফিথ্‌স্ প্রমুখ পণ্ডিতেরা বেদের অনুবাদ করেন।

উর্দ্দু সাহিত্যের ইতিহাস কি ?

আফগান ও তুর্কীরা ভারতে এসে পার্শী শব্দের সঙ্গে হিন্দী ব্যাকরণ জুড়ে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা বলতো সেই ভাষাই উর্দ্দু ভাষা বলে পরিচিত হয়। এর লেখার অক্ষর পারসিক। এই ভাষায় আরবী কথাও আছে। উর্দ্দু সাহিত্যের ইতিহাস যেটুকু পাওয়া গেছে তাতে জানা গেছে বাহমনি রাজ্যের কয়েকজন কবি এই মিশ্রিত ভাষায় প্রথম কাব্য রচনা করেন—এগুলিকে উর্দ্দু সাহিত্যের আদি সাহিত্য বলা চলে। উর্দ্দু সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের মধ্যে সিরাজুদ্দীন সুরী, আর্জ্জু খান, আমীর খসরু, বান্দা নওয়াজ, খুব্ মহম্মদ চিস্তি, গালিব প্রভৃতির নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। আকবরের সময় উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতে উর্দ্দু ভাষা প্রচারের সঙ্গে উর্দ্দু সাহিত্যের বিশেষ প্রসার লাভ ঘটে। উর্দ্দু

সাহিত্য বর্ত্তমানে বিশেষ পুষ্টি লাভ করেছে ও বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলিরও অনুবাদ হয়েছে।

উর্দ্দু সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির স্রষ্টাদের নাম কি ?

উর্দু সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি বলতে অনেকগুলি বই-এর নামই বলতে হয়, তা দেবার মত জায়গা নেই। উর্দু সাহিত্য সম্বন্ধে জানতে হলে বিখ্যাত পণ্ডিত নওয়াব নাসির হোসেন রচিত "দাস্তান-ই-উর্দু" এবং "মোগল-ওর-উর্দু" গ্রন্থখানি পড়তে হবে। বিশেষ করে আমি শুধু উর্দু সাহিত্যের কয়েকখানি বই-এর নাম ও বিভিন্ন নাটক কাব্য ও কাহিনী রচয়িতাদের নাম ছাপালাম।

(১) মহম্মদ হুসেনী বান্দা নওয়াজ রচিত—'সিরাজ-উল-আনিকিন' (২) খুব্ মোহম্মদ চিস্তি রচিত—'খুশ তরঙ্গ' (৩) শাহ আলী মোহম্মদ গ্রামধনী রচিত –'জওয়াহির-ই আসরর আল্লাহ, (৪) শামসুদ্দীন মজহার রচিত—'দেওয়ানী মজহার' (৫) আবদুল হালিম শরার রচিত—(কাহিনী) 'আয়াম-ই আরব' ও 'হুসন্-কা-ডাক্' (৬) প্রেমচাঁদ রচিত (উপন্যাস ও গল্প) —জলওয়া-ই-ইসর-,' 'বজায়-ই-হুসন্', 'সোজী-ই ওয়াতন,' 'খাকী পরওয়ানা' (৭) নাজীর আহম্মদ রচিত (উপন্যাস)—'শির-ত উল্-আজম্', 'তোবা-ভুন্-নুসুহ, (৮) শিব্লি নৈমানী রচিত (জীবনী)—'সিরউল আজম', 'আওরঙ্গ-জেব', 'আল্ফারুক্', (৯) সার সৈয়দ আহম্মদ রচিত (প্রবন্ধ)—'আসর উল্ সনা-দিদি', 'সিল্সিলা-ই-মূল্ক-ই-হিন্দ' (১০) আগা হাশর্ কাশ্মিরী রচিত—(নাটক) 'সুরদাস' 'খবসুরৎ বালা' 'তুর্কী হুর', 'গঙ্গাবতরণ' (১১) মৌলানা আজাদ রচিত—'ফসানা-ই আজাদ' (১২) দেওয়ান শায়দা রচিত—'নমাইচাঁদ' 'কৃষণ বংশী' (১৩) স্যার মহম্মদ ইক্বাল রচিত—'বঙ্গে দরাহ' ও 'বাবে জেব্রাইল' (১৪) পণ্ডিত মেনারাম ওকা (ইনি লেখক ও কবি হিসাবে বর্ত্তমানে বিশেষ বিখ্যাত)—এঁর অসংখ্য গ্রন্থ আছে, তার মধ্যে 'আদরী ইয়াত' চমৎকার বই।

অনূদিত হয়েছে। আধুনিক তামিল সাহিত্যে রাও সাহেব স্থব্রহ্মণিয়া মুদালিয়ারকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলা হয়।

গুজরাটী ভাষা ও সাহিত্যের গোড়ার ইতিহাস কি ?

বর্ত্তমান ভারতবর্ষে গুজরাটী ভাষার সাহিত্যেও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, কাজেই ভারতবাসী হিসাবে এই ভাষার সাহিত্য সম্বন্ধে তোমাদের কিছু জানা উচিত। গুজরাটের ভাষা পশ্চিমা হিন্দী বা রাজস্থানী ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই ভাষার সৃষ্টি হয়েছে প্রাচীন আর্য্যভাষার দক্ষিণ পশ্চিম শাখা থেকে। গুজরাটী সাহিত্যের সবচেয়ে পুরানো রচনা যা পাওয়া যায়, তা হচ্ছে ১১৪৫ শতাব্দীর শালিভদ্র রচিত 'ভর্ত্তেশ্বরবহবলী'। গুজরাটী সাহিত্যের আদিযুগের নাম করা গ্রন্থকার বলতে 'সোমস্থন্দরে'র নাম করা চলে। তিনি গদ্যে ও পদ্যে ব্যাখ্যা ও টীকাকারে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। পৌরাণিক সাহিত্য রচনায় গুজরাটী ভাষায় যাকে গুজরাটী সাহিত্যের জনক বলা হয়, তাঁর নাম 'ভাট্না'। এর পরেই ভক্তিমূলক সাহিত্যের সূচনা হলো পঞ্চদশ শতাব্দীতে নরসিংহ মেহতার রচনায়। নরসিংহ মেহতার রচনার অধিকাংশই হচ্ছে ধর্ম্মমূলক কবিতা, ওঁকেই গুজরাটী সাহিত্যের আদি কবি বলা হয়। প্রাচীন গুজরাটী সাহিত্যে মীরাবাঈ, আখো, প্রেমানন্দ প্রভৃতি দর্শনবিষয়ক প্রবন্ধ ও কাব্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। উনবিংশতি শতাব্দীতে গুজরাটীতে আধুনিক সাহিত্যের ধারা আনেন দলপত রাম, নর্ম্মদাশঙ্কর, মণিলাল, নওলরাম, লক্ষ্মীরাম, রেবাশঙ্কর, শ্যামল ভট্ট প্রভৃতি নাম করা লেখক। গুজরাটী সাহিত্যে গদ্য দেখা দেয় ইংরেজদের যুগে। ১৮৮৫ খৃঃ থেকে ১৯১৪ খৃঃ বর্ত্তমানের গুজরাটী সাহিত্যে নাটক, ছোট গল্প, কবিতা বিশেষ উন্নত হয়ে উঠে, গোবর্দ্ধন রাম ত্রিপাঠী, মণিলাল নাবুভাই, ভোলানাথ দিবিতিয়ার আবির্ভাব হয়।

বর্ত্তমান গুজরাটী সাহিত্যের কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক ও তাঁদের রচনার নাম কি ?

গোবর্দ্ধন রাম রচিত—'সরস্বতীচন্দ্র'; রামন্‌লাল বসন্ত্‌লাল দেশাই রচিত

তামিল ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস কি ?

ভারতের প্রাচীন ভাষাগুলির মধ্যে যে ভাষা দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় ভাষা বলে পরিচিত ছিল,সেই ভাষাই তামিল ভাষায় কালক্রমে রূপান্তরিত হয়েছে। উত্তর ভারতে যেমন হিন্দী ও উর্দ্দু প্রধান ভাষারূপে চলিত তেমনই দক্ষিণ ভারতে এই তামিল ভাষা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। পণ্ডিতদের মতে প্রাচীন তামিল, সাহিত্য-গৌরবে সংস্কৃতের পরেই আসন পেতে পারে। এই তামিল সাহিত্যের সূত্রপাত হয়েছে খৃষ্টীয় নবম, দশম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়টাতে, দাক্ষিণাত্যে জৈনদের প্রভাব তখন খুবই বেশী ছিল। তামিল সাহিত্যের আদিতেও অন্যান্য সাহিত্যের মত এক কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়, এই কাব্যের নাম 'নালড়িয়ার'। এর পরে প্রাচীন তামিল রচনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে 'তিরুবল্লুভবন'-এর রচিত 'কুরাল্'—এই গ্রন্থে পণ্য, ধন ও প্রমোদ সংক্রান্ত ১৩৩০টি ছোট ছোট গান গ্রথিত হয়েছে। এই গীতাবলী তামিল ভাষায় বিভিন্ন সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে ও অনূদিত হয়েছে। তামিল সাহিত্যে উক্ত তিরুবল্লুভন-এর ভাগিনী 'অভ্ভেই' রচিত—'অত্তিসূদ্দী' ও 'কোঁরেইভেইন্দান' নামে দু'টি ছোট ছোট নীতিকাব্য গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়, এ দু'টি বই তামিল স্কুলে পড়ানো হয়। এসব ছাড়া প্রাচীন তামিল সাহিত্যে 'চিন্তামণি' 'দিবাকরম্' ও কম্বন রচিত 'রামায়ণম্' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা বল্লভদেব—যিনি 'অতি বীর রাম পাণ্ডা' বলে পরিচিত ছিলেন—তিনি শ্রীহর্ষ রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ 'নৈষধীয়'-এর অনুকরণে 'নেইদাদম' বলে এক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইনি তামিল সাহিত্যে মৌলিক রচনার আদর ক'রে তামিল সাহিত্যকে উন্নত করে তোলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে—কুমার গুরুপার দেশিকাম রচিত—'নীতিনেরি ভিলক্কম' কাব্য তামিল ভাষায় প্রকাশিত হয়, এটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। আধুনিক তামিল সাহিত্য বিশেষ প্রসার লাভ করেছে ও বিভিন্ন ভাষার বহু বিখ্যাত বইও তামিল ভাষায়

—'পঙ্কজ', 'গ্রাম লক্ষমী', 'হৃদয়বিভূতি' 'ক্ষিতিজ'; শারদাপ্রসাদ বর্ম্মা রচিত—'ঘাড্ডীপাকো', 'রাজকথা',; দত্তাত্রেয় কালেলকার রচিত—'জীবন-বিকাশ,' 'হিমালয়নো প্রভাস', (ভ্রমণ কাহিনী) 'লোকমাতা'; ধূমকেতু বা গৌরীশঙ্কর যোশী রচিত—'পরাজয়', (উপন্যাস) 'তানাখা'; আর্দেশীর ফ্রামজী খবরদার রচিত—(কবিতার বই) 'রাস্ট্রিকা', 'দার্শনিকা', 'ভারতেন-টঙ্কার', 'কল্যাণীকা'। এছাড়া গুজরাটের আধুনিকতম সাহিত্যিকদের মধ্যে কে, এম, মুন্সী বহু উপন্যাস ও নাটক লিখে খ্যাতি লাভ করেছেন। নাট্যকার হিসাবে বাতুভাই লালভাই উমরভাদিয়া, গল্প লেখক হিসাবে রামনারায়ণ বিশ্বনাথ পাঠক (দ্বিয়েত), ধনুসুখলাল মেহতা গুজরাটী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। কবিদের মধ্যে দামোদর বোনাদকার, কেশব শেঠ, উমাশঙ্কর যোশী এবং লেখিকাদের মধ্যে বিদ্যাগৌরী, সুমতী ত্রিবেদী, দীপিকা দেশাই, হানসা মেহটা সমধিক প্রসিদ্ধ।

হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস কি ?

হিন্দী সাহিত্যও এসেছে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ধারা অবলম্বন করে। মাগধী-প্রাকৃত থেকে যেমন বাঙলা ভাষার সৃষ্টি, তেমনই শৌরসেনী-প্রাকৃত ধীরে ধীরে শৌরসেনী অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে হিন্দীতে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রাচীন হিন্দী সাহিত্যে রাজপুতানার বীরদের জয়গাথা এবং প্রাচীন ভক্তদের রচনার সন্ধান পাওয়া যায়—চাঁদ বরদাই রচিত 'পৃথ্বীরাজ রাসো' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাপতির পদাবলী ও চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দে মহাপুরুষ দাদু, কবীর প্রভৃতি মুখে মুখে যেসব পদ রচনা করে উপদেশ দিয়েছিলেন তাই থেকেই হিন্দী ভাষার সাহিত্য সৃষ্টি হয় এ কথা বলা চলে। তবে এইগুলির ভাষা এখনকার হিন্দীর মত ছিল না। তাঁদের সেই সব কবিতা ও পদাবলী সংগৃহীত হয়েছে নানাগ্রন্থে ও বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ইংরেজীতে কবীরের দোঁহা অনুবাদ করেছেন ওয়েস্টকট্ ও মেকলিফ সাহেব। হিন্দী সাহিত্যে কবীর-এর রচনা 'কবীর বচনামৃত' ও 'কবির বিজক' নামে আজও প্রসিদ্ধ

হয়ে আছে। বর্ত্তমানের হিন্দী সাহিত্য উন্নত হয়ে প্রকাশ লাভ করে সম্রাট আকবরের সময়—খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে; সেই সময়ে কুতুব শেখ ও মালেক মহম্মদ জায়সী হিন্দী সাহিত্য রচনা করেন; ভক্ত কবি তুলসীদাস 'রামচরিত মানস' ও অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেন।

মধ্যযুগ অর্থাৎ ১৫৫০ খৃঃ অব্দ থেকে ১৮০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত যে সময়, এই সময়েই হিন্দী কাব্য সাহিত্যের চরম উন্নতির সময় বলে ধরা হয়। এই যুগেই তুলসীদাস ও সুরদাসের কাব্যসাহিত্য হিন্দী সাহিত্যকে গৌরবান্বিত করে তোলে। হিন্দী সাহিত্যও গোড়ার দিকে কবিতার আকারেই প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী যুগের হিন্দী কবি হিসাবে বাবু হরিশচন্দ্র ('ভর্ত্তেন্দু'), 'প্রতাপনারায়ণ' প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ। হিন্দী সাহিত্যে প্রকৃত গদ্য সাহিত্যের প্রচার হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। তখনই হিন্দী সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস 'রাণী কেত্‌কী-কী কহানী' রচনা করেন সৈয়দ ইনসাল্লাহ খাঁন—তাঁকে অনুসরণ করেন শ্রীনিবাস দাস, বালকৃষ্ণ ভট্ট, গদাধর সিংহ, দেবীকানন্দন ক্ষেত্রী প্রভৃতি। দেবীকানন্দনের 'চন্দ্রকান্ত' ২৮ খণ্ডে সম্পূর্ণ এক বিরাট উপন্যাস। এরপর দেখা দেন হিন্দী সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক প্রেমচন্দ্র (১৮৯০-১৯৩৬); প্রেমচাঁদের ছোট গল্পগুলিও ভারতীয় সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে শঙ্করপ্রসাদ নিরাগী কৌশিক, ধনীরাম প্রেম, সুদর্শন প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

হিন্দী সাহিত্যের বিশিষ্ট কয়েকটি সৃষ্টি কি?

প্রাচীন হিন্দী কাব্য সাহিত্য বলতে এই কটি সৃষ্টিকেই বোঝায়:—চাঁদ বর্দাই রচিত—'পৃথ্বিরাজ রসায়'; কবীর রচিত—'কবীর বচনামৃত' ও 'কবীর বিজক'; তুলসীদাস রচিত—'রামচরিত মানস', 'গীতাবলী'; দীন কৃষ্ণদাস রচিত—'রস কল্লোল'; লাল কবি রচিত—'ছত্র প্রকাশ'; সুরদাস রচিত—'সুরসাগর'; কেশবদাস রচিত—'রামচন্দ্রিকা', 'কবি প্রিয়া', 'রসিক প্রিয়া'; বিহারীলাল রচিত—'সাত সইয়া'; রতন-কোঙর রচিত—'রতন হাজরা'; 'সুধা নিধি', 'নীতিকুসুম'।

আধুনিক হিন্দী কাব্য সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি :—অযোধ্যা সিং উপাধ্যায় রচিত—'প্রিয় প্রবাস' ; বাবু হরিশ্চন্দ্র রচিত—'প্রেম মালিকা', 'প্রেম মাধুরী', 'প্রেম-প্রলাপ' ও 'প্রেম কুঞ্জরী' ; মোহনলাল মাহ্‌তো রচিত—'একতারা', 'নির্ম্মাল্য' ; মহাদেবী বর্ম্মা রচিত—'নীহার', 'নীরজা', ও 'রশ্মি' ; মৈথিলী শরণ গুপ্ত রচিত—'কিষান শকেত','ভারত ভর্ত্তি', 'যশোধারা'; সুমিত্রানন্দন পান্থ রচিত—'বীণা', 'গ্রন্থি', 'গুঞ্জন', ও 'পল্লব' ; রামকুমার বর্ম্মা রচিত—'রূপরাশি','অঞ্জলি' ; শ্রীধর পাঠক রচিত—'শ্রান্ত পথিক', 'উজরা গ্রাম' ; অঞ্চল রচিত—'মধুলিকা', 'অপরাজিতা' ও 'কিরণ বেলা' ; শ্রীনারায়ণ অগরওয়াল রচিত—'মানব' ও 'রতিকা রাগ'।

আধুনিক হিন্দী নাট্য সাহিত্যের কয়েকটি বিশিষ্ট সম্পদ :—রাধেশ্যাম রচিত—'উষা অনিরুধ্', 'দ্রৌপদী স্বয়ম্বর', 'শ্রবণকুমার' ; জয়শঙ্কর প্রসাদ রচিত—'প্রায়শ্চিত্ত', 'বিশাখা', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'অজাতশত্রু', 'কামনা', 'রাজ্যশ্রী' ; প্রেমচাঁদ রচিত—'সংগ্রাম', 'কার্ব্বালা' ; বেচন শর্ম্মা উগ্‌রা রচিত—'চুম্বন' ; ভগবৎপ্রসাদ বাজপেয়ী রচিত—'ছলনা'।

আধুনিক হিন্দী কথা সাহিত্য ও উপন্যাস সাহিত্যের কয়েকটি সৃষ্টি :—বেচন শর্ম্মা উগ্‌রা রচিত—'বধূয়া কি বেটী', 'চাঁদ হসিনো কি খাতুত', 'দিল্লীকা দালাল,','শরাবী' ; চক্রসেন শাস্ত্রী রচিত—'হৃদয়কা পরখা', 'হৃদয় কি পেয়াসা', 'অমর অভিলাষ' ; দেবকীনন্দন ক্ষেত্রী রচিত—'চন্দ্রকান্ত সন্তত্তি','কুসুমকুমারী' 'নরেন্দ্র মোহিনী' ; প্রেমচাঁদ রচিত—'গোদান', 'সেবাসদন', 'রঙ্গভূমি', 'কর্ম্মভূমি', 'কাব্যকলাপ', 'প্রেমাশ্রম' ; জি, পি, শ্রীবাস্তব রচিত—'প্রাণনাথ', 'দিলাকী আগা' ; জ্ঞানেন্দ্র কুমার রচিত—'পরখা', 'তপোভূমি' ; শ্রীরাম শর্ম্মা রচিত—'শিকার' (শিকার কাহিনী)।

তেলেগু সাহিত্যের কয়েকটি বিশিষ্ট সৃষ্টি কি ?

নন্নীচোড়াদেবী রচিত—'কুমারসম্ভবম্' ; এম-নরসিংহম্ রাও রচিত—'মুণি মাণিক্যম্ কথলু' ; চক্রপানি রচিত—'পাঞ্চজন্যম্' (রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র,

পরশুরাম, রবীন্দ্র মৈত্র প্রভৃতির বাঙলা গল্পের অনুবাদ); বিশ্ববন্ধু কবিরাজ রচিত—'বিনোদ নাটিকালু' (নাটিকার বই), রয়াপ্রস্থ সুব্বারাও রচিত—'রাম্যালোকম', 'যুগ কৈকেয়' (কবিতার বই)।

আসামী বা 'অহমীয়া' ভাষা ও সাহিত্যের গোড়ার ইতিহাস কি?

প্রাচীন 'আসামী' বা 'অহমীয়া' ভাষার উৎপত্তি হয় টিবেটো চাইনীজ বা ভোট চীন ভাষা গোষ্ঠির ভোটব্রহ্ম (Tibeto Burman) শাখা থেকে। কিন্তু সে ভাষার পরিচয় বর্ত্তমানের আসামী সাহিত্যে বড় একটা মেলে না। বর্ত্তমানের আসামী ভাষা সৃষ্টি হয়েছে—মাগধী বা গৌড়ীয় অপভ্রংশ থেকে। তবে কবে এবং কিভাবে এ ভাষার সৃষ্টি হলো তা সঠিক বলা যায় না। অন্যান্য সাহিত্যের মতই এই ভাষার সাহিত্যেরও জন্ম হয়েছে—আসামীরা মুখে মুখে যে সব গান বেঁধে গাইতো সেই সব 'বিহুগীত' বা 'পল্লী সঙ্গীত' ও 'ছড়া'কে অবলম্বন করেই। তাই পরবর্ত্তী যুগের আসামী সাহিত্যের বিখ্যাত রচয়িতা 'দুর্গাবর', 'পীতাম্বর' 'মানকরে'র রচনায় এমনকি শঙ্করদেবের 'রামায়ণ' গ্রন্থিতে পর্য্যন্ত প্রাচীন 'বিহুগীতে'র প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। আসামী সাহিত্যের যেটুকু ইতিহাস পাওয়া যায়, তা হচ্ছে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর থেকে—এই সময়ে কমতাপুরের রাজা দুর্লভনারায়ণের সহায়তায় সুপণ্ডিত 'হেম সরস্বতী' সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ ক'রে আসামী ভাষায় 'প্রহ্লাদ চরিত্র' ও 'বামন পুরাণ' রচনা করেন। তবে তাঁর সেই আসামী ভাষাকে বলা চলে সংস্কৃত-আসামী, অর্থাৎ সেই ভাষা ঠিক আগেকার যুগের বাঙলা ভাষার মতই সংস্কৃত বহুল শব্দে ভর্ত্তি ছিল। প্রাচীন আসামের কমতাপুরের (নওগাঁ) কচারি রাজবংশের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই আসামী ভাষা ও সাহিত্য উন্নত হয়ে উঠেছে একথা জানা যায়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কবিরাজ মাধব কাপালী প্রথম সমগ্র রামায়ণ অনুবাদ করলেন আসামী ভাষায়। এর পরেই প্রাচীন আসামে 'কচারি রাজত্বের' পতন ও 'অহোম রাজত্বের' অভ্যুদয় হলো। 'অহোম' ও 'কচারি'দের মধ্যে অনবরত লড়াই বিবাদ ঘটতে থাকার ফলে

কোচবংশের রাজা বিশ্বসিংহের অধীনে কুচবিহারের কোচজাতি আসামে দেখা দিলে। বিশ্বসিংহ আসামের রাজা হয়ে কামরূপ থেকে রাজধানী উঠিয়ে কুচবিহারকে আসামের রাজধানী করলেন। ১৫৪০ খৃঃ অব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে মল্লদেব—রাজা নরনারায়ণ নাম নিয়ে রাজা হলেন—এঁর সভায় :আসামের প্রাচীন ধর্ম্মকবি 'শঙ্করদেব', 'মাধবদেব', 'রামসরস্বতী' প্রভৃতি উপস্থিত হয়েছিলেন বলে জানা যায় এবং রাজা নরনারায়ণের রাজত্ব-কালেই অসমীয়া সাহিত্যে নতুন যুগ শুরু হয়। আসামের প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠকবি শঙ্করদেব রচিত 'রামায়ণ', 'রুক্মিণী কাব্য', 'নিভিনাভা সিদ্ধা,' 'বৈষ্ণব অমৃত' প্রভৃতি প্রায় ৩০ খানি গ্রন্থ এই সময় রচিত হয়। তার মধ্যে তাঁর লেখা 'কীর্ত্তনঘোষা' বলে বইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ! অসমীয়া গদ্য সাহিত্যের প্রথম দেখা পাওয়া যায় এই শঙ্করদেবের নাটকেই। তবে অসমীয়া গদ্য সাহিত্যকে উন্নত করে তোলেন কামরূপের অধিবাসী পণ্ডিত 'ভট্টদেব', তিনিই অসমীয়া গদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি এই সাহিত্যের প্রবর্ত্তন করেন। আসামের প্রাচীন গদ্য সাহিত্যে 'বুরান্‌জী' অর্থাৎ ঐতিহাসিক বিবৃতির ধরণের রচনা খুব বেশী পাওয়া গেছে। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অসমীয়া সাহিত্যের আর এক নতুন যুগ চলে। অসমীয়া সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূচনা করেন আনন্দরাম ডেকিয়ান কুপন। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে শিবসাগরের সিকনারীদের কর্ত্তৃক প্রকাশিত অরুণোদয় সংবাদপত্রে তাঁর রচনা প্রকাশিত হতে থাকে—এবং অসমীয়া সাহিত্যে নূতন ধারার সঞ্চার করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে অসমীয়া সাহিত্যকে যাঁরা পুষ্ট করেন—তাঁদের মধ্যে হেমচন্দ্র বড়ুয়া (১৮৩৫-৯৬), লক্ষ্মীকান্ত বেজ-বড়ুয়া ও গুনাভিরাম বড়ুয়ার নাম সমধিক প্রসিদ্ধ ?

বর্ত্তমান অসমীয়া সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য স্মৃষ্টি কি ?

লক্ষ্মীনাথ বড়ুয়া রচিত 'পাহ্ম-কুমারী' (উপন্যাস) 'বুড়ী আইর সাধু কথা' (রূপকথা) 'কাকাদেউতা আরু নটি লেড়া' (উপকথা) ; হেমচন্দ্র বড়ুয়ার

'কানাইয়ার কীর্ত্তন', 'বাহিরে রঙ সঙ ভিতরে কোয়া-ভাতুরী'; রজনীকান্ত বরদলৈ রচিত 'মিরি জিয়ারী', 'মনোমতী', 'রহদাই লিগিরী'; যতীন্দ্রনাথ ডুয়ারা'র 'রুবাইয়াৎ' (অনুবাদ) প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া নাট্যকার পদ্মনাথ গোঁসাই বড়ুয়া, বেণুধর রাজখোয়া, কবি হিতেশ্বরবর বড়ুয়া, পদ্মাবতী ফুকানী, ধৰ্ম্মেশ্বরী দেবী, অম্বিকাগিরীচৌধুরী, রঘুনাথ চৌধুরী, নলিনীবালা দেবী, দেবকান্ত বড়ুয়া, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির রচনাবলী ও সত্যনাথ বোরা রচিত 'সারথি' ও 'সিন্তাকলি' অসমীয়া সাহিত্যে প্রসিদ্ধ। প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্যে ডাঃ বাণীকান্ত কাকোতি, সূর্য্যকুমার ভুইয়ান্ ও বেণুধর শর্ম্মার রচনাও বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ছোট গল্প রচনায় দৈবচন্দ্র বড়ুয়া, শরৎ গোস্বামী, নব্বনচন্দ্র ভুইয়ান, মহীচন্দ্র বড়ুয়া, লক্ষ্মীধর শর্ম্মা, বীণা বড়ুয়া, রামদাস প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

প্রাচীন বাঙলা-সাহিত্যের গোড়ার ইতিহাস কি?

বাঙলা ভাষা কি ভাবে সৃষ্টি হয়েছে সে কথা মধুভাণ্ডের প্রথম ভাগেই বলেছি কাজেই সে সম্বন্ধে এখানে কিছু বলার দরকার নেই। তবে বাঙলা সাহিত্যের সূত্রপাত হয় ১৩৫০ খৃষ্টাব্দের পর। প্রাচীন বাঙলার শ্রেষ্ঠকবি বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' এই যুগের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অবদান। ১৪০০ থেকে ১৫০০ খৃষ্টাব্দের বাঙলা ভাষা ও সেকালের সাহিত্য প্রাচীন বহু পুঁথি পত্তরে রক্ষিত হয়েছে। এই সময়েই কবি কৃত্তিবাস ওঝার 'ভাষা রামায়ণ' মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' প্রভৃতি গ্রন্থের সৃষ্টি হয়। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এই বাঙলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবন ও শিক্ষাকে অবলম্বন করে যে নূতন ভাবধারা বাঙলা ও উৎকলে (উড়িষ্যায়) এলো তারই ফলে বাঙলা সাহিত্যে ও উড়িয়া সাহিত্যে দেখা দিল একযুগ। বাঙলায় বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রচার হলো। প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হলো—(১) বৃন্দাবন দাস কৃত 'চৈতন্য ভাগবত' (১৫৭৩), (২) লোচন-দাস কৃত 'চৈতন্যমঙ্গল' (১৫১৩-১৫৮০), (৩) কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত 'চৈতন্য-চরিতামৃত'। সেই যুগে বৈষ্ণব সাহিত্য ছাড়া আরও কতকগুলি বিভিন্ন

ধরণের সাহিত্য-সৃষ্টি বাঙলা সাহিত্যকে পুষ্ট করে তোলে। তার মধ্যে ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় ভাগে মাধবাচার্য্য ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী প্রত্যেকে ১ খানা করে 'চণ্ডীমঙ্গল-কাব্য লেখেন, সেই দু'টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ষোড়শ শতকেই ময়মনসিংহের নারায়ণদেব ও কবি কাশীদাস 'পদ্মপুরাণ'-গ্রন্থে চাঁদ-সদাগর ও বেহুলা লক্ষীন্দরের উপাখ্যান লেখেন।

সপ্তদশ শতকের গোড়াতেই কাশীরাম দাস বাঙলা ভাষায় 'মহাভারত কাহিনী' লেখেন। তবে তার আগে ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে চট্টল প্রান্তের অধিবাসী কবীন্দ্র ও শ্রীকর নন্দী 'বিজয়-পাণ্ডব-কথা' নামে মহাভারতের এক বাঙলা অনুবাদ করেন। এই সময়ে কেতকদাস ক্ষেমানন্দের রচিত 'মনসার ভাসান' কাব্য বাঙলা সাহিত্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। সপ্তদশ শতকে কয়েকজন মুসলমান কবি বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করে তোলেন—তার মধ্যে কবি দৌলত কাজীর 'সতী ময়না'; মহম্মদ খাঁর 'মকতুল হোসেন', 'কেয়ামৎ নামা'; আব্দুল নবীর 'আমীর হাম্‌জা' বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল বলে সন্ধান পাওয়া গেছে। এই সব সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে বড় হয়ে তোমরা পরিচিত হবে। অষ্টাদশ শতকে বাঙলার ইতিহাসে নানা গোলমাল দেখা দেয় ও নানা বিষয়ে;বাঙলার পতন ঘটতে থাকে, কাজেই তার সাহিত্যও বিশেষ বেড়ে উঠতে পারেনি এই যুগে। এ যুগের দু'চারজন কবির নাম করা যেতে পারে—রামপ্রসাদ সেন (১৭৭৫), ভারতচন্দ্র রায় কবি গুণাকর (১৭১২-১৭৬০), জয়নারায়ণ ঘোষাল প্রভৃতি। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গল কাব্য' 'বিদ্যাসুন্দর' বাঙলা প্রাচীন সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। অষ্টাদশ শতকেই বাঙলা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। সে যুগের পর্ত্তুগীজ পাদরীরা এই বিষয়ে প্রথম চেষ্টা করেন। মধুভাণ্ডের প্রথম ভাগে সে কথা তোমরা পড়েছ। বাঙলা সাহিত্যে বহু প্রশ্নের জবাব সেখানেই পেয়েছ বলে এখানেই এটা শেষ করি।

বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন কি আছে ?*

বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীনতম প্রমাণ হিসাবে সংগৃহীত হয়েছে ১৯১৩ সালে, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চেষ্টায়—'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়' (নেপালের প্রাচীন পুঁথি) ও শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় ১৯১৭ সালে আবিষ্কার করেছেন প্রাচীন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' পুঁথি। পরলোকগত ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি এবিষয়ে বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেছেন।

ধর্ম্ম, সমাজ ও সভ্যতা

শিণ্টোইজম্ (Shintoism) কি ?

'শিণ্টোইজ্‌ম্' প্রাচীন কালের জাপানের জাতীয় ধর্ম্মনীতি—এর আদর্শ মূলতঃ জাপানের বিভিন্ন উপজাতির পূর্ব্বপুরুষ ও বীরদের পূজা, কিন্তু এই ধর্ম্মের দেবতা হিসাবে প্রকৃতি—যেমন সূর্য্য, পৃথিবী, অগ্নি এবং মানব সমাজের জীবন-যাত্রা প্রণালীর অধিপতিরা,—যেমন খাদ্যদেবী ; অথবা মানবধর্ম্মের গুণগুলি,—যেমন কায়িক পুষ্টি, মানসিক পুষ্টি প্রভৃতির উপাসনাও চলিত আছে। এই ধর্ম্মে প্রধান দেবতা 'আমাতেরাসু' সূর্য্যপত্নী। জাপানের সম্রাটকে তাঁর অংশসম্ভূত হিসাবে ধরা হয়, এবং তাঁকে অবতার বলে গণ্য করা হয়। এই ধর্ম্মের কোন প্রতিমা নেই—তবে বিশ্বাস করা হয় যে, এই সব দেবতার আত্মারা সেই সমস্ত মন্দিরে বর্ত্তমান যেখানে প্রাচীন বীর বা বীরাঙ্গনাদের স্মৃতি আছে, শিণ্টোদের মন্দিরে প্রতীক হিসাবে সযত্নে রক্ষা করা হয়—একটি আয়না, একটি তরবারি এবং কতকগুলি মণি-মাণিক্য। এই ধর্ম্মের প্রধান অনুজ্ঞা হচ্ছে 'রাজানুগত্য'—অর্থাৎ রাজার অনুগত থাকতেই হবে। বর্ত্তমান জাপানে দু'রকমের শিণ্টোধর্ম্ম গড়ে উঠেছে—একটি হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক—এবং অন্যটি সাম্প্রদায়িক। শিণ্টোধর্ম্মের পুরোহিতদের পদমর্য্যাদা অনুসারে বলা হয়—'শিঙ্কান' ও

"শিন্‌শোকু"। জাপানে এই 'শিণ্টো' ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বর্ত্তমানে প্রায় ১ কোটি ৭২ লক্ষ।

'আর্য্যসমাজ' কি? এই সমাজের আদর্শ কি?

১৮৮৫খৃষ্টাব্দে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বোম্বাই শহরে এই ধর্ম্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমাজের সভ্যরা একেশ্বরবাদী; পৌত্তলিকতা মানেন না, ও জাতিভেদ বিশ্বাস করেন না, কিন্তু বেদের অনুশাসন, বেদের ক্রিয়া কর্ম্ম, ও অহিংস যাগ-যজ্ঞ, হোম প্রভৃতির অনুষ্ঠানে আস্থা রাখেন। এঁদের মতে 'শুদ্ধি' দ্বারা অপর ধর্মের লোককে আর্য্য করা যায়। এই সমাজ এইভাবে বহু লক্ষ পতিত ও বিভ্রান্ত হিন্দুকে 'শুদ্ধ' করে স্বধর্ম্মে ফিরিয়ে এনেছেন। হরিদ্বার গুরুকুলে ১৯০২ সালে এই সমাজ এক আশ্রম ও বিদ্যালয় গড়ে তুলেছেন। এই সমাজের প্রধান আদর্শ হচ্ছে সংস্কারমুক্ত আদর্শ হিন্দু-সংগঠন।

ওয়াক্‌ফ্ (Wakf) কি?

মুসলমান ধর্ম্মানুযায়ী ধর্ম্মকার্য্য করবার জন্য—বহু ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান তাঁদের সম্পত্তি দান করে গেছেন। ঐ সমস্ত সম্পত্তিকে 'ওয়াক্‌ফ্' স্টেট বলে—এই 'ওয়াক্‌ফ্' স্টেট বা সম্পত্তিগুলি তদারক করার জন্য এদেশের গবর্ণমেণ্ট একটি আইন করে এক বিভাগ খুলেছেন। এই বিভাগের কর্ত্তা হিসাবে একজন 'রিসিভার' নিযুক্ত হন, তিনিই এই সমস্ত সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা করেন।

'কন্‌ভেণ্ট' (Convent) ও 'মোনাস্ট্রি' (Monastery) কি?

ঐ দুটি শব্দই ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের মঠকে বোঝায়—'কন্‌ভেণ্ট' বলতে সন্ন্যাসিনীদের মঠ, 'মোনাস্ট্রি' বলতে সন্ন্যাসীদের মঠ বোঝায়। ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীরা যেসব বিদ্যালয় পরিচালনা করেন—সেগুলিকেও 'কন্‌ভেণ্ট' বলা হয়।

'হিন্দু-মেলা' কি?

খৃষ্টীয় ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময়টাতে নবগোপাল মিত্র বলে এক যুবক এই 'হিন্দুমেলা' দল গড়ে বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে

তোলার বিশেষ চেষ্টা করেন। তিনি বালক ও যুবকদের শরীরচর্চা ও ব্যায়ামাদির জন্য বিভিন্ন জায়গায় আখড়া গ'ড়ে তোলেন—ও দেশের শিল্পের উন্নতির নানা চেষ্টা করেন। 'হিন্দুমেলা' প্রদর্শনীতে স্বদেশী পণ্যদ্রব্য দেখানো হত, ব্যায়ামাদির প্রতিযোগিতা হত ও জাতীয়তার সাড়া জায়গায় এমন সমস্ত গান ও বক্তৃতা হতো। মহর্ষি 'হিন্দুমেলা'র একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—রবীন্দ্রনাথও ছোটবেলাতে এই 'হিন্দুমেলা' থেকে তাঁর জীবনের প্রেরণা পান—একথা কেউ কেউ বলেন। তবে এদেশের লোকের সহানুভূতি ও দূরদৃষ্টির অভাবে এই 'হিন্দুমেলা'র উদ্দেশ্য সফল হতে পারেনি।

'দালাই লামা' ও 'তাশি লামা' কে ?

এই দুটিই তিব্বতের দুটি বিভিন্ন ধর্ম্মগুরুর নাম। তিব্বতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগুরু ও রাজ্যগুরু হচ্ছেন 'দালাই লামা'—ইনি 'লাসা' মহানগরীর 'পোতল'প্রাসাদে বাস করেন। এঁরই প্রায় সমতুল্য হচ্ছেন 'তাশি লামা'—তিনি থাকেন 'তাসিলুন্‌সো' বিহারে। দালাই লামার চেয়ে এঁর সম্পত্তি কম। ১৯০৪ সালে বৃটিশ অভিযানের পর দালাই লামার অনুপস্থিতিকালে ইনিই ছিলেন অন্যান্য 'লামাদের' গুরু।

'খাল্‌সা' সম্প্রদায় কি ? কিভাবে গড়ে ওঠে ?

শিখদের মধ্যে নানক যে ধর্ম্মসাধনা প্রচার করেন—তা লোকে মেনে নিয়েছিল বটে, কিন্তু জাতিভেদ ও বর্ণ বৈষম্যকে ভুলতে পারেনি। উচ্চবর্ণই সমাজে প্রাধান্য পেত। গুরু গোবিন্দ সিংহ এসব দেখে ঘোষণা করলেন যে, সকল শিখ সমান। জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেই 'শিখ' হতে পারে। গুরুর এই ঘোষণাকে মেনে নিয়ে সেকালের শিখরা 'পাহুল' বলে এক উৎসব করে জাতি ও বর্ণের ভেদাভেদ ভুলে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করলে। গুরুজী ভেদবুদ্ধি ভুলে 'খাল্‌সা' বা মন পবিত্র করার উপদেশ দিলেন। গুরুজী ঘোষণা করলেন শিখরা কেউ উপবীত রাখতে পারেবে না—তাদের মধ্যে জাতিগত ও ব্যবসায়গত কোনও পার্থক্য থাকবে না—সকলের উপাধি হবে 'সিংহ', প্রত্যেক

'খাল্সা' শিখকে কৃপাণ নিতে হবে, লোহার বালা পরতে হবে—চুল-দাড়ী রাখতে হবে ও 'কচ্ছ' বা ছোট পায়জামা পরতে হবে—এই নির্দ্দেশ দেওয়া হলো। এর ফলে 'খাল্সা' সম্প্রদায় এক শক্তিশালী যোদ্ধা-জাতিতে পরিণত হলো।

'খোদা-ই-খিদ্‌মৎগার' সমাজ কি ?

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেসকর্ম্মী আবদুল গফুর খাঁ 'খোদা-ই-খিদ্‌মৎগার' দল নামে সমাজ সেবার উদ্দেশ্যে অহিংস নীতি অবলম্বী এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেছেন। 'খোদা-ই-খিদ্‌মৎগার' কথাটির অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের চাকর বা আজ্ঞাবহ। গবর্ণমেণ্ট কিছুকাল এই দলকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করেছিলেন—এখন সে আদেশ রদ করা হয়েছে। এই দলের স্বেচ্ছাসেবকরা মুসলমান হলেও সাম্প্রদায়িকতা মানে না।

'গ্রন্থ-সাহেব' কি ?

এটি হচ্ছে শিখদের ধর্ম্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থে প্রথম গুরু নানক প্রভৃতি গুরুদের উপদেশ ও সঙ্গীতাদি সংগৃহীত হয়, পরে তেগ বাহাদুর ও গুরু গোবিন্দ সিংহের উপদেশও যোগ করা হয়। কবীর, নামদেব, মীরাবাঈ, রামানন্দ, জয়দেব প্রভৃতি ১৯ জন সাধক ভক্তের উপদেশও এই গ্রন্থে আছে। এই গ্রন্থটি অমৃতসরে শিখ 'গুরুদ্বার' স্বর্ণমন্দিরে রাখা আছে; এটি সেখানে পূজা পায়, কারণ শিখদের কোন দেবদেবী নেই। এই গ্রন্থটি সর্ব্বদা পড়া হয়—একজনের পর আর একজন এসে দিনরাত এই পড়া চালিয়ে যাচ্ছে। এই পাঠকে বলা হয় 'অখণ্ড পাঠ'।

'তত্ত্ববোধিনী সভা' কবে কি উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল ?

১৮৩৯ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন যুবক মিলে কলিকাতায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনার জন্য এই সভা গড়ে তোলেন। ১৮৪৩ সাল থেকে এই সভার মুখপত্ররূপে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক—পরের যুগে দ্বিজেন্দ্রনাথ,

সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। এই সভা গঠনের ফলে দেশে যে নূতন চিন্তাধারার জন্ম হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'অনুশীলন সমিতি' কি?

১৯০৪ খৃঃ অব্দে যখন বঙ্গ-বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়, তখনই ঋষি অরবিন্দের ভাই বারীন্দ্র কুমার ঘোষ বাঙলার নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে এই 'অনুশীলন সমিতি' গড়ে তোলেন। এই সমিতির সভ্যদের প্রধান কাজ ছিল লাঠি খেলা, ব্যায়াম, জুজুৎসু প্রভৃতি শরীর চর্চ্চা, গীতাপাঠ, ইতিহাস ও রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা। ঢাকার 'অনুশীলন সমিতি' খুব বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল—ঢাকার নেতা ছিল প্রসিদ্ধ লাঠি-খেলোয়াড় পুলিনবিহারী দাস। এই সমিতির সভ্য হতে হলে নানারকম প্রতিজ্ঞা করতে হতো। এই সমিতির শক্তির প্রভাব সেকালের যুবকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল, এই সব সমিতির যুবকরা নাকি বৈপ্লবিক অনুষ্ঠানে লিপ্ত হয়—এবং সেই অপরাধে গবর্ণমেণ্ট এই সমিতিগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করেন।

'খাক্‌সার' দল কি?

১৯৩২ খৃঃ অব্দে আল্লামা ইনায়েতুল্লা মাশরেকী 'খাক্‌সার' নাম দিয়ে এক সমাজ গড়েন। এই সমাজের উদ্দেশ্য হজরত মোহম্মদ কর্ত্তৃক প্রচারিত প্রকৃত ইসলাম ধর্ম্মের প্রচার ও মুসলিম ধর্ম্মে যে সমস্ত কুসংস্কার ও গোঁড়ামি প্রবেশ করেছে সেগুলিকে দূর ক'রে বর্ত্তমান মুসলিম জাতিকে একটি নিয়মতান্ত্রিক শক্তিশালী সামরিক জাতিতে পরিণত করা। 'খাক্‌সার' দল তিন শ্রেণীতে ভাগ করা—(১) জাঁবায (২) জানিসারী (৩) গাঁয়র জাঁবায। এ ছাড়া একদল সাধারণ সভ্যও আছে। খাক্‌সাররা সৈনিকদের মত পোষাক পরে ও হাতে একটি ক'রে 'বেল্‌চা' বা খোন্তা বহন করে। কিছুদিন আগে এই খাক্‌সার আন্দোলনকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছিল।

'আবেস্তা' কি ?

প্রাচীন পারসিকদের ধর্ম্মগ্রন্থের নাম 'আবেস্তা'—কেউ কেউ 'জেন্দ আবেস্তা' বলেন। 'জেন্দ' মানে প্রাচীন ভাষা। সাধারণের বিশ্বাস 'আবেস্তা'র একখানি মাত্র গ্রন্থ ছিল—সেটি আলেকজান্দারের পারস্য আক্রমণের সময় নষ্ট হয়ে যায়।

'খিলাফৎ' আন্দোলন কি ?

প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক হেরে যাওয়ার পর সন্ধির সর্ত্তানুসারে তুরস্কের সুলতান ওরফে ইস্‌লামের খলিফা বা ধর্ম্মগুরুর সম্মান বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হয়েছে এই অজুহাতে খলিফার হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য ১৯২০ খৃঃ অব্দে এক আন্দোলন সৃষ্টি হয়—এই আন্দোলন 'খিলাফৎ' আন্দোলন নামে পরিচিত।

'অসহযোগ আন্দোলন' (Non-Co-operation Movement) কি ?

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একটি বিশেষ অঙ্গ। ভারতে বিপ্লবাত্মক প্রচেষ্টা দমন করবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৯১৯ সালের ২৩শে মার্চ্চ 'রৌলট এ্যাক্ট' (Rowlatt Act) পাশ করেন। এই বিধি বা এ্যাক্টের প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 'অহিংস অসহযোগ আন্দোলন' শুরু হয়। ১৯২০সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে এই 'অহিংস আন্দোলনের' প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই কংগ্রেসে ঠিক হয় যে গবর্ণমেণ্টকে কোনও বিষয়ে কোন রকম সহযোগিতা না দিয়ে—গবর্ণমেণ্টকে অকেজো ক'রে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যে এই সব কর্ম্মপন্থা বা উপায় ঠিক করা হয়—সরকারী খেতাব, ও অবৈতনিক সরকারী কার্য্য ত্যাগ; সরকারী ভোজ, দরবার প্রভৃতিতে যোগ না দেওয়া; সরকারী স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখা ও জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে তোলা; উকিল মোক্তারদের সরকারী আদালত ত্যাগ ও সালিশী কোর্ট স্থাপন, সামরিক কাজকর্ম্ম ও সরকারী অফিসের কেরাণীগিরি ত্যাগ। এই আন্দোলন ঐ সময়ে বিশেষ সাফল্য লাভ

করে ও গবর্ণমেণ্ট বিব্রত হয়ে পড়েন, কিন্তু নানা কারণে এই আন্দোলন বেশীদিন শক্তিশালী থাকতে পারেনি।

'আইন অমান্য আন্দোলন' (Civil Disobedience Movement) কি ?

ভারতের রাজনৈতিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে ১৯২৯ সালে বিলাতে 'গোল টেবিল' বৈঠক বসবার প্রস্তাব হয়। এই সময় মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, মিঃ জিন্না, ভি-জে-প্যাটেল ও তেজবাহাদুর সপ্রু তখনকার বড়লাট লর্ড আরুউইনের সঙ্গে দেখা করেন ও লাট সাহেবের কাছে এই প্রতিশ্রুতি চান যে, গোল টেবিল বৈঠকে ভারতকে 'ডোমিনিয়নের' মর্য্যাদা বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা দেওয়া হবে। বড়লাট সে-রকম কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে অক্ষমতা জানান। ঠিক তার পরেই লাহোর কংগ্রেসে ঠিক হলো যে, কংগ্রেস গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেবে না—দেশে আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করবে। প্রথমে লবণ আইন ভেঙ্গে এই আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৩০ সালের ১১ই মার্চ মহাত্মা গান্ধী সদলবলে সবরমতী থেকে ২৫৮ মাইল পথ হেঁটে ডাণ্ডির সমুদ্রতীরে যাত্রা করলেন—৬ই এপ্রিল সমুদ্রের তীরে গবর্ণমেণ্টের লবণ তৈরীর নিষেধাজ্ঞা অস্বীকার ক'রে লবণ তৈরী করলেন। ঐ দিন ভারতের নানা জায়গায় ঐ ভাবে আইন ভেঙ্গে লবণ তৈরী হয়। এই সময় বাঙলাদেশে 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স' আইন আবার জারী করা হলো—বহু যুবককে বিনা বিচারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আটক করলেন—সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করবার জন্য 'প্রেস অর্ডিন্যান্স' জারী হলো। ১৯৩০ সালের ৪ঠা মে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার ক'রে অন্তরীণ করা হলো। ১৯৩০ সালে এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য ভারতবর্ষে ৫০০৪৯ জনের শাস্তি হয়। ১৯৩১ সালে বিলাতে প্রথম 'গোল টেবিল বৈঠক' বসলো—লর্ড আরউইন কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ করলেন ও গান্ধীজীর সঙ্গে কয়েকটি চুক্তি হবার পর 'আইন অমান্য' আন্দোলন রদ করা হয়।

'ট্রেড-ইউনিয়ন' (Trade Union) কি ?

শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যে মিলনকেন্দ্র বা শ্রমজীবী-সঙ্ঘ গড়ে তোলে তাকেই 'ট্রেড-ইউনিয়ন' বলা হয়। 'ট্রেড-ইউনিয়ন'কে সাধারণভাবে মালিকরা সর্ব্বত্র স্বীকার ক'রে নেন। এর সূত্রপাত ১৯০০ শতকে—তখন থেকেই কল-কারখানার শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে শুরু করে। ১৮২৪ খৃঃ অব্দের আগে মজুরদের পক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াটা বে-আইনী ছিল। এর পরে কমিউনিস্ট সমাজের প্রবর্ত্তক কার্ল মার্কস (Karl Marx) প্রভৃতির আন্দোলনের ফলে শ্রমিকদের মধ্যে জাগরণ ঘটে ও আত্মকর্তৃত্বের চেষ্টা দেখা দেয় ; তার ফলে ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন সম্ভব হয়। ট্রেড-ইউনিয়নের প্রত্যেক সদস্যকে তার মাইনের টাকা থেকে কিছু টাকা কেটে চাঁদা দিতে হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৮ সালে মাদ্রাজে "টেক্সটাইল লেবর ইউনিয়ন" গড়ে ওঠে। সেটাই ভারতের প্রথম ট্রেড-ইউনিয়ন। তারপর থেকে ভারতবর্ষে এই 'ট্রেড-ইউনিয়ন' ছড়িয়ে পড়েছে। এই 'ট্রেড-ইউনিয়ন' গুলি রেজিস্টারী করা প্রতিষ্ঠান। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ অনুযায়ী এদেশের শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনার জন্য ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেস নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ফলে শ্রমিকরা মালিকদের কাছ থেকে অনেক সুখ সুবিধা আদায় করতে পারছে।

বৌদ্ধদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ কি ? তাতে কি আছে ?

বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থগুলি সাধারণতঃ তিনভাগে ভাগ করা—সুত্ত, বিনয় ও অভিধর্ম্ম এবং এই এক একটি ভাগের গ্রন্থগুলি যে এক একটি পিটক বা পেটিকায় রাখা হতো সে বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ 'ত্রিপিটক' নামে বিখ্যাত। 'সুত্ত' পিটকে বুদ্ধদেব গল্পের ছলে নানা ধর্ম্মোপদেশ দিয়েছেন, 'বিনয়' পিটকে তিনি শীলাদি শিখিয়েছেন। আর 'অভিধর্ম্ম' পিটকে আছে প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শনের কথা। বর্ত্তমানে 'থেরবাদী' বা স্থবিরবাদীদের যে 'ত্রিপিটক' পাওয়া যায় তা

পালি ভাষায় লেখা। এই ত্রিপিটক ৮৪০০০ ধর্ম্মখণ্ডে বিভক্ত—১১৮৩ পরিচ্ছেদ ও ৯৪৬৪০০০ অক্ষর আছে। ত্রিপিটকের অতি আধুনিক সংস্করণ চীনা ভাষায় তৈরী হয়েছে। এর নাম "Issai Kyo"—এই গ্রন্থটি সম্পাদন করেছেন ডক্টর জুনাজিরো টাকাকুশু, ডক্টর কাইকাইয়োক ও ওয়াটানাবে বলে চীনা ভাষার তিন জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত।

'বাইবেল' কি?

'বাইবেল' বলতে বর্ত্তমানে খৃষ্টানদের পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ বোঝায়—কিন্তু এটিকে ঠিক একটিমাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ বলা যায় না। কারণ সমগ্র 'বাইবেল' বলতে ৬৬টি গ্রন্থের সমষ্টি বোঝায়। বাইবেল প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা—একটিকে বলা হয় 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট' (Old Testament), অপরটি হচ্ছে 'নিউ টেস্টামেণ্ট' (New Testament). 'Testament' বলতে বোঝায় 'আপোষ বোঝা-পড়া'—অর্থাৎ ঈশ্বর এবং তাঁর সৃষ্টদের মধ্যে যে বোঝাপড়া চলছে তারই বিবৃতি। 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট' অংশটি হলো প্রধানতঃ একদল ইহুদীদের ধর্ম্মসাহিত্য ও ইতিহাস। এই ইহুদীদল এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন এবং ধার্ম্মিক, ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। প্রাচীনকালের ছোট্ট দেশ প্যালেস্টাইনের চারিধারে যখন শক্তিশালী জাতিরা সমবেত হয়েছিল—তখন তারা নানা দেবদেবীতে বিশ্বাস করতো—কিন্তু 'ইস্‌রাইল' এই একেশ্বরবাদ বিশ্বাস করতেন এবং কৌশলে সবাইকে একেশ্বরবাদে আস্থাবান ক'রে তোলেন। 'নিউ টেস্টামেণ্ট' অংশটিতে প্রধানতঃ আছে যীশুর জীবনী, তাঁর বাণী ও অলৌকিক সব ক্রিয়াকাণ্ডের বর্ণনা। এই 'বাইবেল' (ওল্ড টেস্টামেণ্ট অংশ) যীশুর জন্মের বহুপূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম হিব্রু ভাষায় রচিত হয়। এবং ১৫০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বীরা ইহুদীদের 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট'কেই খৃষ্টানদের একমাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ বলে জানত। বহু পরে খৃষ্টানধর্ম্মের প্রধান প্রধান সাধুরা যীশুর মৃত্যুর পর গ্রীক ভাষায় এই 'নিউ টেস্টামেণ্ট' সঙ্কলন করতে থাকেন।

'কোর্‌আন্' কি ?

'কোর্‌আন্' হচ্ছে মুসলমানদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ। এই 'কোর্‌আন্'কে 'পবিত্র কোর্‌আন' বলা হয়; কারণ, মুসলমানদের বিশ্বাস ও তাঁদের মতে কোর্‌আন হচ্ছে 'আল্লাহ'র বা ঈশ্বরের বাণী, এবং স্বর্গীয় দূত জিব্‌রাইল মারফৎ ক্রমাগত ভাবে মানুষের সমাজের কল্যাণের প্রয়োজনে হজরৎ মোহম্মদের নবী জীবনের ২৩টি বছর ধরে তাঁর প্রতি প্রেরিত। হজরৎ যখন বেঁচেছিলেন—তখনই এই সমস্ত বাণী চামড়া ও আধারে লিখিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর প্রথম খলিফা আবু-বকর সেই সমস্ত হাতেলেখা গ্রন্থ—ও যাঁদের 'কোর্‌আনের' বাণী কণ্ঠস্থ ছিল, বা যাঁরা হজরতের সময় 'কোর্‌আন' লিখতেন, তাঁদের সমবেত সাহায্যে সমস্ত বাণীগুলিকে এক ক'রে প্রথম 'কোর্‌আন' লিপিবদ্ধ করান। 'কোর্‌আন' আরবী ভাষায় সুললিত প্রাঞ্জল ছন্দোবদ্ধ গদ্যে রচিত, ত্রিশ খণ্ডে ও একশত চৌদ্দ অধ্যায়ে ভাগ করা। আরবী সাহিত্য হিসাবেও 'কোর্‌আন' বিশেষ প্রসিদ্ধ। 'কোরআন' ব্যতীত 'তফ্‌সীর', 'হাদীস্', 'ফেকাহ্' প্রভৃতি মুসলমানদের ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে প্রসিদ্ধ।

হাতে লেখা প্রাচীন 'বাইবেল' পুঁথি কোথায় কোথায় আছে ?

প্রাচীন বাইবেলের হাতে লেখা পুঁথিগুলিকে—'পেশিটো' (Peshito) বলা হয়। তিনটি প্রাচীন 'বাইবেল' আছে। এগুলি Vellum পত্রের উপরে লেখা। একটি আছে বৃটিশ মিউজিয়মে—তার নাম 'Codex Sinnaiticas'—এটি সিরিয়ান ভাষায় লেখা। এইটিই সবচেয়ে প্রাচীন বাইবেল। অপর দুটি 'হাতে-লেখা' প্রাচীন বাইবেলের একটি আছে রোমের ভাটিক্যান প্রাসাদে—অপরটি আছে রুশিয়াতে।

অষ্টাদশ 'পুরাণের' নাম কি ?

হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্রে ১৮ খানি পুরাণ প্রধান পরিগণিত হয় এবং এই পুরাণের সমষ্টি 'অষ্টাদশ পুরাণ' নামে বিখ্যাত। তবে এ বিষয়েও মতভেদ আছে। (১) ব্রহ্মপুরাণ (২) পদ্মপুরাণ (৩) বিষ্ণুপুরাণ (৪) বায়ুপুরাণ (৫) ভাগবতপুরাণ (৬)

নারদীয়পুরাণ (৭) মার্কণ্ডেয়পুরাণ (৮) অগ্নিপুরাণ (৯) ভবিষ্যপুরাণ (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ (১১) লিঙ্গপুরাণ (১২) বরাহপুরাণ (১৩) স্কন্দপুরাণ (১৪) বামন পুরাণ (১৫) কূর্ম্মপুরাণ (১৬) মৎস্যপুরাণ (১৭) গরুড়পুরাণ (১৮) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

'উপনিষদ্' বলতে কি বোঝায় ?

বেদের পরবর্ত্তী সাহিত্য বা বৈদিক সাহিত্য তিনভাগে ভাগ করা : ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ। কোন কোন উপনিষদ ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকেরই অংশ। উপনিষদগুলি ব্রহ্ম বা পরমাত্মা সম্বন্ধে নানা তথ্য ও তর্কপূর্ণ তত্ত্বকথায় পূর্ণ আছে। আসলে উপনিষদগুলি হচ্ছে প্রধানতঃ ক্ষত্রিয় রাজাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পূর্ণ। প্রধান 'উপনিষদ' বলতে ১২খানি উপনিষদ বোঝায়। ঋগ্বেদীয় উপনিষদ হচ্ছে—(১) ঐতরেয়। (২) কৌশীকী। সামবেদীয় উপনিষদ হচ্ছে —(১) তৈত্তিরীয় (২) কঠ (৩) শ্বেতাশ্বতর। শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় উপনিষদ হচ্ছে— (১) বৃহদারণ্যক (২) ঈশ (৩) প্রশ্ন (৪) মুণ্ডক (৫) মাণ্ডুক্য।

মুসলমানদের 'হজ্' যাত্রা কি ?

হজরৎ মহম্মদের জন্মভূমি সৌদি আরবের রাজধানী মক্কা সহর ও মদিনায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাই এই দুটি জায়গাই মুসলমানদের পবিত্র তীর্থ স্থান। প্রাচীনকালের হজ বা হেজাজ রাজ্য এইখানেই ছিল। মদিনাতে হজরৎ মহম্মদের কবরের উপর এক প্রকাণ্ড মসজিদ আছে এবং মক্কায় হজরত মহম্মদের জন্মভূমির পীঠস্থানকে একটি কাবা মসজিদ রক্ষা করছে। এইখানে জিব্রাইল কর্তৃক ইব্রাহিমকে প্রদত্ত একটি কালো পাথর আছে। প্রতি বছর 'রমজান' মাসে পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে প্রায় দেড় লক্ষ ধার্ম্মিক মুসলমান এই তীর্থে সমবেত হয়। মদিনার তীর্থক্ষেত্রটি দামাস্কাস সহর থেকে ৮২০ মাইল দূরে হেজাজ রেলপথের শেষ সীমানায় অবস্থিত। আরও দক্ষিণে ২০০ মাইল দূরে 'মক্কা' শহর। লোহিত সাগরের 'জেড্ডা' বন্দর থেকে এই শহরটি ৫৫ মাইল দূরে। জেড্ডা থেকে মোটরে মক্কা যাওয়ার রাস্তা তৈরী হচ্ছে। পবিত্র রমজান মাসে সাধারণতঃ মুসলমানরা হজ যাত্রা করেন।

ইসলামের বিভিন্ন ধর্ম্মমত কি? কোন্ মতের নেতা কে?

হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে যেমন বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমত আছে, ইসলাম ধর্ম্মেও সেইরকম ভিন্ন ভিন্ন মত ও সম্প্রদায় আছে। তার মধ্যে ইমাম আবু হানিফার প্রবর্তিত মত—'হানাফী'; ইমাম শাফেয়ীর মত—'শাফেয়ী', ইমাম মালেকের মত—'মালেকী'; ও ইমাম ইবনে আহম্মদ হাম্বলের মত—'হাম্বলী' নামে মুসলমানদের কাছে বিশেষ পরিচিত।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

প্রাচীনকালে এদেশে শিক্ষাব্যবস্থা কেমন ছিল?

প্রাচীন কালেও এদেশে স্কুল পাঠশালার মতই বিদ্যায়তন ছিল। তবে তখনকার শিক্ষাপ্রণালী ছিল নৈতিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। দেশের মহা মহা নগর থেকে দূরে জনকোলাহলের বাইরে নির্জ্জন অরণ্যের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে আশ্রম বা তপোবন জাতীয় শিক্ষাকেন্দ্রগুলি গড়ে উঠতো। এই সমস্ত আশ্রম বা তপোবনে ছেলেমেয়ে সকলকে এক সঙ্গে রেখে শেখানো হতো সেকালের যত সব প্রচলিত বিদ্যা। জ্ঞানী ঋষি বা গুরুর অধীনে শুদ্ধাচারী আদর্শবাদী ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মচারিণীরাই এই সব শিক্ষাকেন্দ্রে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতেন। ধনী ও দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীরা এক সঙ্গে সাধারণ ভাবে পর্ণ কুটীরে বা কুঁড়ে ঘরে বাস করতো। শহরে যাঁরা থাকতেন তাঁরা ও শিক্ষার্থী শিক্ষার্থিনীদের অভিভাবকেরা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য শহর থেকে ভারে ভারে খাদ্যসম্ভার আশ্রমে ও তপোবনে পাঠিয়ে দিতেন। দেশবাসীরা উৎসবাদিতে অধ্যাপক ও শিক্ষকদের নিমন্ত্রণ ক'রে এনে বিদায় স্বরূপ যথোচিত দক্ষিণাদি দিয়ে তাঁদের ব্রতের সহায়তা করতেন। কাজেই ছাত্র-ছাত্রীদের ভরণপোষণ করতেন আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষ ও অধ্যাপকরা। দেশীয়

রাজারা শিক্ষার জন্য বহু অর্থ দান করতেন। আশ্রম ও তপোবনের পর প্রাইভেট স্কুল ধরনের শিক্ষায়তনও পরে গড়ে ওঠে—এগুলিকে বলা হতো 'মহাশালা'—প্রাচীন গ্রন্থে এই ধরণের শিক্ষায়তনের উল্লেখ আছে—বিহার অঞ্চলেই এই রকম ৪।৫টি 'মহাশালা' ছিল বলে জানা যায়। প্রাচীনকালে এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ও গড়ে উঠেছিল বলে জানা যায়।

ভারতের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কি কি? কোথায় কোথায় ছিল? কি নাম?

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তক্ষশিলা, বৈশালী ও বারাণসীতে। তার মধ্যে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত ও প্রাচীন। ভারতবর্ষ ও পারস্যের সীমান্তে অবস্থিত ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শিক্ষার সমাবেশ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফৎই প্রথম সম্ভব হয়েছিল। তারপর, বৌদ্ধযুগে গড়ে ওঠে নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী জগদ্দল ও শ্রীধনকটক বিশ্ববিদ্যালয়। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা করতে আসতেন—শিক্ষা লাভের পর নিজের দেশে ফিরে যেতেন। এছাড়া কাশী, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, বিক্রমপুর ও কোটালী-পাড়াতেও বিখ্যাত সমস্ত জ্ঞানচর্চ্চা ও বিদ্যাচর্চ্চার কেন্দ্র ছিল। নবদ্বীপে বাঙলার পণ্ডিতদের মিলনক্ষেত্র ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অষ্টাদশ মহাবিদ্যা শেখানো হতো।

অষ্টাদশ মহাবিদ্যা কি?

অষ্টাদশ মহাবিদ্যা হচ্ছে—বেদ, বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ, স্মৃতি, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ, অর্থশাস্ত্র, গজশাস্ত্র ইত্যাদি। এই সব বিদ্যার পরীক্ষাও যে নেওয়া হতো তার প্রমাণ প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্যাদিতে পাওয়া যায়।

নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বাংলার কোন্ কোন্ বিশেষ ব্যক্তির নাম জড়িত?

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য শীলভদ্র, চন্দ্রগোবিন্দ ও শান্ত রক্ষিত।

বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেতারিক, অভয়াকর গুপ্ত, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের নাম প্রসিদ্ধ।

পশ্চিম গোলার্দ্ধের সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় আছে?

পশ্চিম গোলার্দ্ধের সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়, যেটির অস্তিত্ব আজও বজায় আছে সেটি হচ্ছে পেরু প্রদেশের লিমা শহরের স্যান মার্কোস (San Marcos) বিশ্ববিদ্যালয়। এটি ১৫৫১ খ্রীঃ অব্দে স্থাপিত হয়েছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবে ও কি ভাবে গড়ে ওঠে? তার গোড়ার ইতিহাস কি?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৫৭ সালের ২৪শে জানুয়ারী। আর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে সব আইন কানুন দরকার হয়েছিল তাও সেই সময়েই বিধিবদ্ধ হয়। সেই আইনের নাম হয় Act No. 2 of 1857. কলিকাতার এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট মাদ্রাজ আর বোম্বাই শহরেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করলেন। তবে তখন কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ই হয়ে উঠল সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্ববিষয়ে অগ্রগণ্য। —৭টি সরকারী কলেজ, ৬টি বে-সরকারী কলেজ ও মাত্র ৭১টি স্কুল নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠলো—প্রথম ভাইস্-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হলেন মাননীয় স্যার জেম্স উইলিয়াম কোল্ভিল। ১৮৫৭ সালে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয় তখন তার নিজস্ব কোনও বাড়ী ছিল না, ১৮৬৪ সালে বর্ত্তমান সিনেট হাউসের জন্য জায়গা ঠিক করা হয়—এবং ১৮৭২ সালে ৪ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ব্যয়ে বর্ত্তমান সিনেটের বাড়ীটি তৈরী হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগারের ইতিহাস কি?

১৮৬৯ সালের ২০শে জুলাই উত্তরপাড়ার জমিদার রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরী গড়ে তোলার জন্য ৫ হাজার টাকা দান করেন। তারপর থেকেই লাইব্রেরী গড়ার চেষ্টা চলতে থাকে—১৮৭৪ সালে ৯০০০৲ টাকা খরচ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীকে বাড়ানো হয়।

বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে নানা ভাষা ও নানা বিষয়ের বই এক লক্ষের অধিক সংগৃহীত হয়েছে। বাংলা ভাষার বহু প্রাচীন পুঁথি এই লাইব্রেরীর সংগ্রহের মর্য্যাদা বাড়িয়েছে। তাছাড়া বহু গবেষণাযোগ্য বস্তুতে পরিপূর্ণ আশুতোষ সংগ্রহশালাও (Museum) এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা কি ভাবে চলে?

বর্ত্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয় চারিটি শিক্ষায়তন বা শিক্ষা বিভাগে ভাগ করা —প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজীয় ও পোস্ট গ্রাজুয়েট বিভাগ। ২৩টি শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে—মোট ২৫৫ জন অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় বার্ষিক ব্যয় ৩৭ থেকে ৩৮ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট দেন ৫ লক্ষ টাকারও কম।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়টি নাম করা অধ্যাপনাবৃত্তি বা প্রোফেসারশীপ্ (Professorship) আছে? সেগুলির নাম কি?

(১) ঠাকুর ল প্রোফেসারশীপ্ (২) মিণ্টো প্রোফেসারশীপ্ (৩) জর্জ্জ দি ফিফ্থ প্রোফেসারশীপ্ (৪) হার্ডিঞ্জ প্রোফেসারশীপ্ (৫) কারমাইকেল প্রোফেসারশীপ্ (৬) আশুতোষ প্রোফেসারশীপ্ (৭) পালিত প্রোফেসার-শীপ্ (৮) রাসবিহারী ঘোষ প্রোফেসারশীপ্ (৯) খয়রা প্রোফেসারশীপ্ (১০) রামতনু লাহিড়ী প্রোফেসারশীপ্ এই মোট ১০টি অধ্যাপনাবৃত্তি আছে। অর্থাৎ এই অধ্যাপনাবৃত্তি বিভিন্ন লোকের দানের টাকা থেকে অধ্যাপকদের দেওয়া হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করা পদক (Medal) বৃত্তি (Scholarship) ও লেক্চারশীপ্ (Lectureship) গুলির নাম কি?

সমস্ত পদক, বৃত্তি প্রভৃতির নাম করা সম্ভব নয়—প্রধান প্রধান পদক, বৃত্তি সম্বন্ধে কিছু জানিয়ে রাখি। **প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি**—১৮৬৬ সালে বিখ্যাত ধনকুবের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের হাতে ২ লক্ষ ৫০ টাকা

দান করেন। তারই নির্দ্দিষ্ট আয় থেকে প্রতি বছর দশ হাজার টাকা এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গবেষণাকারী ছাত্রকে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। বর্ত্তমানে সে ব্যবস্থা বদলে প্রতি বছর এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এমন চারিটি ছাত্রকে ২৫০০৲ করে টাকা দেওয়া হয়, যারা এই বৃত্তির 'থিসিস্' বা গবেষণাপত্র রচনা ক'রে কৃতিত্ব দেখাতে পারে। (২) **জগত্তারিণী পদক**—বাঙলা ভাষায় সবচেয়ে ভাল রচনার জন্য প্রতি দু'বছর অন্তর যাঁরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোনও বৃত্তি পাননি এমন যোগ্য ব্যক্তিকে ২০০৲ টাকা দামের স্বর্ণপদক দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে এই মর্ম্মে স্যার আশুতোষ তাঁর মায়ের নামে ৩০০০৲ টাকা দান করে যান। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অমৃতলাল বসু, স্বর্ণকুমারী দেবী, কামিনী রায়, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী এবং আরও অনেকে এই পদক :লাভ করেছেন। (৩) **কমলা লেক্চারশিপ্** (Kamala Lectureship)—স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪০০০০ হাজার টাকা দান করে এই 'বক্তৃতাবৃত্তি'র ব্যবস্থা করে গেছেন। স্যার আশুতোষের মেয়ের নাম ছিল কমলা—তাঁরই নামানুসারে এই বৃত্তির নামকরণ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত বক্তাকে ইংরাজী বা বাঙলায় এই বক্তৃতা দিতে হয়—বক্তা বক্তৃতার জন্য ১০০০৲ টাকা পারিশ্রমিক পান। রবীন্দ্রনাথ, অ্যানি বেসাণ্ট, সরোজিনী নাইডু, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, রাধাকৃষ্ণণ, প্রভৃতি এই বক্তৃতা দিয়েছেন।

বিখ্যাত ও প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় বলতে কোন্‌গুলিকে বোঝায়?

ইউরোপের অন্যতম বিখ্যাত ও প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। ফ্রান্সের 'ইউনিভারসিটি অফ প্যারিস'কেও ইউরোপের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ধরা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনার জন্য বিখ্যাত। বোলোনে বিশ্ববিদ্যালয় (Bologne University) রোমান এবং ক্যানন আইন অধ্যাপনার জন্য বিখ্যাত। Salerno University চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপনার জন্য বিখ্যাত। স্কটল্যাণ্ডের প্রাচীন

বিশ্ববিদ্যালয় হলো সেন্ট এণ্ডরুজ বিশ্ববিদ্যালয়। ইতালীর প্যাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ও পৃথিবীর প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়—৮২৫ খৃস্টাব্দে স্থাপিত মিশরের কায়রোস্থ আল্ আজহার (Al-Azher) বিশ্ববিদ্যালয়ও খুব প্রাচীন। সুইডেনের আপসালা বিশ্ববিদ্যালয়, রুশিয়ার মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়, পোল্যাণ্ডের ক্রাকাও বিশ্ববিদ্যালয়, ডেনমার্কের কোপেন্হাগেন্ বিশ্ববিদ্যালয়, সুইজারল্যাণ্ডের ব্যাসেল বিশ্ববিদ্যালয় ও নেদারল্যাণ্ডের লিডেন (Leyden) বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ প্রসিদ্ধ।

পৃথিবীর মধ্যে কোন্ স্কুলটিতে জলের তলায় ক্লাস বসে ?

মিয়ামী বিশ্ববিদ্যালয়ে জলজ জীবতত্ত্বের ছাত্রদের গবেষণার জন্য জলের তলায় কাচের ঘর করে জলের নীচে নামিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে—জলের তলায় ছাত্রেরা ডুবুরীর পোশাক পরে নেমে গিয়ে সামুদ্রিক গাছগাছড়া জীবজন্তু নিয়ে গবেষণা করে—যখন তারা জলের তলায় অধ্যয়ন করে তখন ওপর থেকে তাদের অক্সিজেন যোগানোর ব্যবস্থা থাকে।

মন্তেসরী স্কুল (Montessori School) কি ? ও মন্তেসরা পদ্ধতি কি ?

ম্যারিয়া মন্তেসরী বলে এক ইতালীয় মহিলা-চিকিৎসক শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন সেটাই 'মন্তেসরী পদ্ধতি' (Montessori system) নামে পরিচিত এবং এই প্রথায় যে সব স্কুল পরিচালিত হয় সেগুলিকেই 'মন্তেসরী' স্কুল বলা হয়। মন্তেসরী স্কুলের মূল আদর্শ হলো শিশুদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। ডাঃ মন্তেসরীর বিশ্বাস যে, শিশুকে যদি তার নিজের পছন্দ মত জিনিষগুলি নিয়ে ছোটবেলা থেকে কর্ম্মরত হতে দেওয়া হয়, তবেই শিশু তার নিজের বৈশিষ্ট্য বাড়াতে পারে এবং আত্মনির্ভরশীল হতে ও অপরের অধিকারের তারিফ করতে শেখে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের তাড়না বা হুকুম করার অধিকার থাকে না—শিক্ষক শুধু ছাত্রদের তদারক করেন ও পথ বাতলিয়ে দেন। এই পদ্ধতিতে পুরস্কারের প্রলোভন, আদেশ ও শাস্তির ভয় দেখিয়ে শিশুর শিক্ষার আগ্রহকে জাগানো নিষেধ।

আপন আনন্দের মাঝখানে শিশু যাতে তার শিক্ষায় আগ্রহশীল হয়ে ওঠে শুধু সেই প্রণালী অবলম্বন করা হয়। এই পদ্ধতিতে দ্বিতীর বৈচিত্র্য হলো যে এ পদ্ধতিতে 'অনুভূতি শক্তির অনুশীলনের' (Sense training) উপর বেশী জোর দেওয়া হয়। উপযুক্ত অনুশীলনের পথে শিশু যাতে বিভিন্ন দৃশ্য, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ ও স্বাদে তার তারতম্য বুঝতে শেখে সে ব্যবস্থাও আছে। তৃতীয় বৈচিত্র্য হলো শিশুকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালীর কাজগুলিও খেলার ছলে অনুশীলন করানো হয়, যেমন ঝাঁটা দিয়ে সাফ করা, কাপড়চোপড় কাচা, সেলাই বোনা, বাসনমাজা ইত্যাদি। মন্তেসরী প্রথায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য ডাঃ মন্তেসরী কতকগুলি বিশেষ যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন—সেগুলির নাম "ডায়াডাক্টিক্ এপারেটাস্" (Diadactic Apparatus). এই জিনিষগুলি শিশুদের হাতে দেওয়ার ফলে শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই শিশুরা আস্তে আস্তে শিক্ষার পথে এগিয়ে চলে। উদাহরণ স্বরূপ যেমন কতকগুলি ধাঁধা আছে—ধাঁধাটির একটি টুক্রো কেবল আর একটি মাত্র টুক্রোর সঙ্গে খাপে খাপে মিলতে পারে - এই ধাঁধাটি থেকে শিশু বস্তুর আকার ও ঘনত্বের তফাৎ বুঝতে শেখে। জামা পরতে শেখানোর জন্য—ফিতে পরানো ও বোতাম লাগানোর নানারকম খেলা আছে। এই রকম বহু খেলনা, বিশেষ বিশেষ যন্ত্র মন্তেসরী পদ্ধতির শিক্ষায় ব্যবহার করা হয়। এই শিক্ষায় কাজকেই খেলার রূপ দেওয়া হয়েছে, নিছক খেলা বা অর্থহীন আনন্দের কোনও ব্যবস্থা এই পদ্ধতিতে নেই।

কিণ্ডারগার্টেন (Kindergarten) পদ্ধতি কি ?

জার্মান মনস্তত্ত্ববিদ্ ফ্রেডরিখ উইহেল্ম্ অগস্ট ফ্রোয়েবেল্ (Friedrich Wilhelm August Froeble) শিশুদের শিক্ষাপদ্ধতি সংস্কার করার জন্য বহু গবেষণা করেন ও ১৮৩৮ সালে জার্মানীর থুরিঙ্গেন প্রদেশে জঙ্গলের ভিতরে ব্লাকেন্বার্গ বলে ছোট্ট গ্রামটিতে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিশুদের একটি স্কুল খোলেন—হু'বছর পরে ১৮৪০ সালে এই স্কুলটির

তিনি নাম দেন 'কিণ্ডার গার্টেন'—এটি জার্মান শব্দ—যার অর্থ হলো 'শিশুদের বাগান'। ফ্রোয়েবেল দিবারাত্র শিশুদের নিয়ে তাদের আগ্রহ লক্ষ্য করতেন ও সেই অনুযায়ী শিক্ষার নানারকম খোরাক যোগাতে থাকেন। ফলে তাঁর গবেষণা নিত্য নূতন সন্ধান আবিষ্কার করে। বর্ত্তমানে তাঁর প্রবর্ত্তিত এই 'কিণ্ডারগার্টেন' প্রথা পৃথিবীর সকল সভ্যদেশের শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থায় কাজে লাগানো হয়েছে। কিণ্ডারগার্টেন স্কুলকে শুধু খেলার স্কুল বলা চলে না, যদিও এই পদ্ধতির শিক্ষায় খেলাধূলাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। খেলাধূলাই শিশুদের শৈশবের অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকে এবং খেলাই হলো প্রকৃতির নিজস্ব এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা যার ভিতর দিয়ে শিশুরা ধীরে ধীরে শারীরিক, মানসিক ক্ষেত্রে বড় হয়ে ওঠে। ফ্রোয়েবেল্ বিশ্বাস করতেন - শিশুর শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শিশুর আপন স্বভাব যাতে নিজের চেষ্টায় নিজেকে প্রকাশ করতে পারে সেই বিষয়ে সহায়তা করা। কারণ শৈশবে শিশুর আপনাকে প্রকাশ করার পরিকল্পনাটি অত্যন্ত অস্পষ্ট, অনির্দ্দিষ্ট ও নির্বুদ্ধিতায় পূর্ণ থাকে। সে তখন তার নিজের যোগ্যতা, নিজের প্রয়োজন ও নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে কোনও কিছুই বোঝে না। শিশুদের যাঁরা শিক্ষক হবেন তাঁরা এই বিষয়ে স্নেহ ও সহযোগিতা দিয়ে এই বিষয়ে তাদের সাহায্য করবেন। সেইজন্য 'কিণ্ডারগার্টেন' প্রথাটি পরিকল্পিত হয়েছে শিশুকে স্বাভাবিক উপায়ে শিক্ষিত করবার উপযুক্ত করে। এই পদ্ধতিতে শিশুর চারিধারে এমন পরিবেশ (Environment) গড়ে দেওয়া হয়, যাতে শিশু আপন থেকেই তার বর্ত্তমান অভাব, প্রয়োজন, আগ্রহ ও যোগ্যতা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠে এবং এই পদ্ধতিতে শিশুকেঁ এমন সমস্ত জিনিষপত্র ও সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে যাতে শিশু আনন্দের মাঝখানে তাকে ষোল আনা প্রকাশ করতে পারে। এই পদ্ধতিতে শিশুর শিক্ষার জন্য যে সব কর্ম্মপন্থা ও বস্তু ব্যবহার করা হয়—তাকে মোটামুটি এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (১) উপহার (Gifts) (২) কাজ (Occupations) (৩) খেলাধুলা (Games)

(৪) গান (Songs) (৫) গল্প (Stories)—'উপহার' Gifts বলতে যে বস্তুটি কিণ্ডারগার্টেন প্রথায় শিশুকে দেওয়া হয়—তা দশ দফায় ভাগ করা। প্রথম দফা হচ্ছে একটি বাক্সে ৬টি কাঠের বল দেওয়া হয়—লাল, নীল, বেগুনী, কমলালেবু, সবুজ ও হলদে রঙের এই ছ'টি বল মাত্র। দ্বিতীয় দফায় দেওয়া হয়, একটি বাক্সে শক্ত কাঠের তৈরী তিনটি বিভিন্ন আকারের জিনিস—একটি গোল বল, একটি চার চৌকো কাঠের কিউব (Cube) ও একটি কাঠের সিলিণ্ডার। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ দফার উপহারগুলি বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারের নিরেট কতকগুলি কাঠের টুকরো। সপ্তম উপহার হচ্ছে কাঠের বা কার্ডবোর্ডের কতকগুলি তিনকোণা চৌকো টুকরো। অষ্টম দফার উপহার হচ্ছে একটি বাক্সে কতকগুলি রঙীন লম্বা কাঠের ছড়ি। নবম দফার উপহার হচ্ছে বৃত্তাকার ও অর্দ্ধবৃত্তাকার কতকগুলি রিং ও চাকতি। দশম উপহার হচ্ছে একটি বাক্সে কতকগুলি গাছের বীজ, নুড়ি পাথর ও সমুদ্রের ঝিনুক শঙ্খ ইত্যাদি। এই উপহারগুলি পেয়ে শিশুরা মনে করে খেলার জিনিস—কাজেই সে এইগুলি নিয়ে মনোযোগের সঙ্গে নাড়াচাড়া করে এবং তাই থেকে আস্তে আস্তে বিভিন্ন রং, বস্তুর বিভিন্ন আকার সংখ্যা, রেখা ও গঠন বুঝতে শেখে। এই জিনিসগুলির সাহায্যেই তাদের বর্ণমালা বা অক্ষর গড়তে শেখানো হয় এবং সেই অক্ষরগুলির সাহায্যে তারা আবার বানান করতে শেখে, এইগুলি বইয়ের কাজ করে, অথচ ছোটরা তা মোটেই বুঝতে পারে না। এই জিনিসগুলির সাহায্যেই শিশু তার কল্পনাশক্তিকে রূপ দিতে সক্ষম হয়, যেমন কাঠের বিভিন্ন আকারের টুক্‌রোগুলি নিয়ে সে আপন মনে ঘরবাড়ী, পুল তৈরী করতে শুরু করে দেয়। কখনো বা ঐ সব নানা জিনিসের জোড়াতাড়া লাগিয়ে সে ছবির পরিকল্পনাও করে ফেলে। এই সঙ্গে শিশুরা যে জিনিসগুলি চায় নাচ, গান, খেলা আর গল্প, তারও চমৎকার ব্যবস্থা আছে কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির শিক্ষায়। এই পদ্ধতি শিশুদের শিক্ষার জগতে এক নূতন আলো এনেছে। এদেশে এই ধরণের হাজার হাজার স্কুল গড়ে না

তোলা পর্য্যন্ত শিশুর শিক্ষা তথা ভবিষ্যৎ জাতির শিক্ষা অনেকখানি অপূর্ণ থাকবে।

'অর্গানিক শিক্ষা' পদ্ধতি কি ?

কেবলমাত্র আলবামার ফেয়ারহোপ্ বলে শহরে অবস্থিত 'দি স্কুল অফ্ অর্গানিক এডুকেশন' স্কুলে অর্গানিক শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রায় ত্রিশ বছর আগে Mrs. Marieta Johnson বলে এক মহিলা এই নূতন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তাঁর বিশ্বাস, শিক্ষাই হচ্ছে জীবন—স্কুলের শিক্ষাপদ্ধতি শরীর ও মনকে যাতে মুক্তজীবনের সঙ্গে যুক্ত করে সেই ব্যবস্থা করা। এই পদ্ধতিতে স্কুলে শিক্ষার কোনও বাঁধা-ধরা Standard বা মান নির্দ্ধারিত করা হয়নি—এই স্কুলে কোন গ্রেড্, নম্বর দেওয়া বা প্রমোশনের ব্যবস্থা নেই। ছাত্রেরা নিজেরাই জীবনের সন্ধানে নিজের নিজের চেষ্টায় পড়াশুনা করে জ্ঞান বাড়িয়ে চলে।

'ব্রেইল' প্রথা (Braille system) কি ?

অন্ধদের লেখাপড়া শেখার জন্য কাগজের ওপর উঁচু উঁচু ফুটকী দিয়ে যে বর্ণমালা তৈরী হয় তাকে 'ব্রেইল প্রথা' বলে। মঁসিয়ে লুই ব্রেইল বলে একজন অন্ধ মাথা ঘামিয়ে এই বর্ণমালা তৈরী করেন। মাত্র ছ'টি ফুটকীকে বিভিন্ন-ভাবে সাজিয়ে এক একটি অক্ষর বোঝানো হয়—ফুটকীর অবস্থান হাত দিয়ে অনুভব ক'রে অন্ধরা বর্ণপরিচয় করে। বাঁ-দিক থেকে ডানদিকে এই বর্ণমালা পড়তে হয়। ১৮৭১ সালে অন্ধদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই প্রথা বৃটিশ ও অন্যান্য বৈদেশিক অন্ধদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বীকৃত হয়। বাংলা ব্রেইল প্রথার বর্ণমালা তৈরী করে দেন ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। অন্ধ বাঙালীদের কাছে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ব্রেইল প্রথায় হাতে করে লিখতে অনেক সময় লাগে বলে আজকাল অন্ধদের স্কুলে Braille Typwriter বলে একরকম যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে অন্ধদের পাঠ্যপুস্তক তৈরী হয়।

নোবেল পুরস্কার (Nobel Prize) কি ?

শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার ও প্রচারে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এই পুরস্কারটিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও সম্মান বলে ধরা হয়। সুইডিশ বৈজ্ঞানিক আলফ্রেড নোবেল ১৮৯৬ সালের ১০ই ডিসেম্বর মারা যান এবং ১ কোটি ৭৫ লক্ষ পাউণ্ডের সম্পত্তি রেখে যান। এই সম্পত্তির আয় থেকে প্রতি বছরে পদার্থ-বিদ্যা (Physics), রসায়নশাস্ত্র (Chemistry), ভেষজবিদ্যা (Medicine), সাহিত্য ও শান্তি স্থাপনার জন্য পাঁচটি বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হয়। এই পুরস্কারের মূল্য ৮০০০ পাউণ্ড প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। এক একটি বিভাগে অনেক সময়ে এক বা একাধিক ব্যক্তির মধ্যে পুরস্কার ভাগ করে দেওয়া হয়। এই পুরস্কার দেওয়ার জন্য এক 'ট্রাস্টি' সভা আছে, তাঁরাই পুরস্কাব দেওয়ার যোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচন করেন। যে বছর কোনও বিভাগবিশেষে পুরস্কার দেওয়ার যোগ্য পাত্র পাওয়া যায় না, সে বছর সে বিষয়ে পুরস্কার দেওয়া হয় না।

ভারতবর্ষের 'শিক্ষাপদ্ধতি'র উন্নতির জন্য আধুনিককালে যে সব পরিকল্পনা রচিত হয়েছে সেগুলির নাম কি ?

ভারত গবর্ণমেণ্ট সময় ও যুগের পরিবর্ত্তনানুযায়ী ভারতের শিক্ষা পদ্ধতির উন্নতির জন্য উন্নত ধরণের পরিকল্পনা প্রস্তুতার্থে কতকগুলি শিক্ষাবিশারদকে নিযুক্ত করেছিলেন—তাঁদের বিবৃতি বা পরিকল্পনাটি 'এ্যাবট্-উড্ রিপোর্ট' নামে ১৯৩৭ সালের ১৯শে জুলাই প্রকাশিত হয়। তাছাড়া ভারতে উন্নততর শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্ত্তনের পথ নির্দ্ধারণের জন্য ১৯৩৭ সালে ২৩শে অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর উদ্যোগে ও ডাঃ জাকির হোসেনের আহ্বানে ওয়ার্দ্ধায় এক শিক্ষাসম্মেলনের অধিবেশন হয়। এই সম্মেলনে সারা দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রায় ২০০ শিক্ষাব্রতী যোগ দেন। এই সম্মেলনে ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনায় স্থিরীকৃত হয় যে দেশের শিক্ষাকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে হবে—এবং সমস্ত শিক্ষা মাতৃভাষায় দেওয়া উচিত এবং এই শিক্ষা ব্যবস্থা কোন কায়িক উৎপাদনশীল কর্ম্মপন্থাকে কেন্দ্র করে গঠিত হওয়া উচিত।

এই পদ্ধতিতে—(১) সূতাকাটা ও তাঁতবোনা (২) কৃষিকার্য্য (৩) কাষ্ঠকারু বা ছুতোরের কাজ (৪) ফল ও শব্জীর বাগান করা (৫) চামড়ার কাজ প্রভৃতি শিল্পকে শিক্ষার অন্তর্গত করার প্রস্তাব হয়েছে। এছাড়া অঙ্কশাস্ত্র, সামাজিক শাস্ত্র, সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, জীবতত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শরীরতত্ত্ব, গৃহতত্ত্ব, রসায়নশাস্ত্র, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত প্রভৃতিকে বাধ্যতামূলক শিক্ষায় পরিণত করা। এটি অবলম্বন করেই বর্ত্তমান ভারতের বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি রচিত হয়েছে।

লিখে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা কবে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়?

প্রাচীনকালে ছাত্রদের মুখে মুখে প্রশ্ন ক'রে—তার উত্তর জেনে নেওয়ার ব্যাপারটাকেই পরীক্ষা বলা হোত। লিখিত পরীক্ষার দেওয়ার ব্যবস্থা ১৭০২ সালে কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। তার আগে এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অজানা ছিল।

ট্রাইপোস্ (Tripos) কি ?

কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশেষ 'অনার্স' পরীক্ষার নাম। মধ্যযুগে একটি তিনপায়া টুলের ওপর বসে এই পরীক্ষার্থী ছাত্রকে অধ্যাপকদের সঙ্গে পরীক্ষার বিষয় আলোচনা করতে হতো ব'লে ঐ পরীক্ষার নাম ট্রাইপোস্ হয়েছে। 'ট্রাইপোস্' পরীক্ষা পাশ করতে ৪ বছর পড়তে হয়। পরীক্ষায় যাঁরা পাশ করেন তাঁদেরও 'ট্রাইপোস্' বলা হয়।

এ যুগের পৃথিবী-বিখ্যাত কয়েকজন ও তাঁদের পরিচয়

সাহিত্যে, শিল্পে, রাষ্ট্রনীতিতে ও অন্যান্য বিষয়ে আজকাল দেশবিদেশের যে সব ব্যক্তির নাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে—তাঁদের মধ্যে যাঁরা বর্ত্তমানে জীবিত আছেন বা অল্পদিন হলো পরলোক গমন করেছেন তাঁদের পরিচয় সকলেই অহরহ জানতে চায়—তাই তেমন কয়েকটি বিশেষ ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দিলাম।

রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত পরিচয় কি ?

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পরিচয় কে না জানে ? ভারতবর্ষের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর খ্যাতি সারা পৃথিবীতে যেমন করে ছড়িয়ে পড়েছে, তেমন খ্যাতি এদেশের আর কেউই লাভ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের নাম সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে শ্রদ্ধার সঙ্গে মানুষ স্মরণ করবে—কারণ তাঁর মানবপ্রীতি, মানবমনের প্রতি শ্রদ্ধানুরাগ ছিল অতুলনীয়। তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় হলো—১৮৬১ সালের ৬ই মে (বাংলা সন ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ) কলিকাতার জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ জমিদার বংশ ঠাকুর পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র—আমাদের রবীন্দ্রনাথ। তিনি ছোটবেলায় কয়েকটি স্কুলে ভর্ত্তি হন ; কিন্তু স্কুলের শিক্ষাতে তাঁর মন ভরেনি। তিনি বাড়ীতে গৃহশিক্ষক ও পিতার কাছে ছোটবেলাতেই নানা শাস্ত্র ও ভালো ভালো বই পড়ে—নিজস্ব শিক্ষাধারাকে গড়ে তোলেন। তাঁর এই শিক্ষার সাধনালব্ধ অসীম সম্পদ তিনি তাঁর রচনা, ভাষণ ও আলাপের মধ্যে দিয়ে সমস্ত জগৎকে দান করে গেছেন। ভারতের নিজস্ব শিক্ষাধারাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য—কলিকাতা থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে বোলপুরে তিনি "বিশ্বভারতী" বলে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই "বিশ্ববিদ্যালয়" প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। ১৯১৩ সালে—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টা হিসাবে তিনি বিখ্যাত

নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯১৪ সালে তাঁকে রাজকীয় সম্মান 'নাইট' উপাধি দেওয়া হয়, কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগে ভারতীয়দের উপর ইংরাজদের অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদে—সেই উপাধি পরিত্যাগ করেন। তিনি পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই আমন্ত্রিত হয়ে ভ্রমণ করেন এবং বহু সম্মান লাভ করেন। কলিকাতা, বেনারস, ঢাকা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে "ডক্টর অফ্ লিটারেচার" উপাধিতে ভূষিত করে। সাহিত্যস্রষ্টা হিসাবে তিনি যত রচনা করেছেন, এত বেশী রচনা এ যুগে আর কেউই করতে পারেন নি। ১৯৪৩ সালের ৭ই আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয়।

মহাত্মা গান্ধীর পরিচয় কি ?

ইনি ছিলেন ভারতের জনগণের মূর্তপ্রতীক, রাজনৈতিক গুরু ও নেতা। সমগ্র পৃথিবীর শান্তিকামী ও শ্রেষ্ঠ মনীষী—১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর কাথিয়াবাড় প্রদেশের অন্তর্গত পোরবন্দরে এঁর জন্ম হয়। বাবার নাম করমচাঁদ গান্ধী, মায়ের নাম পুতলীবাঈ। ছোটবেলাতে ইনি পোরবন্দর ও রাজকোটেই কাটান। ১৮৮৭ সালে রাজকোট থেকে ইনি ম্যাট্রিক পাশ করেন—১৩ বছর বয়সে কস্তুরীবাঈয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়। তারপর তিনি ব্যারিস্টারী পড়তে বিলাত যান। ১৮৯১ সালে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এসে প্রথম বোম্বাইতে ও পরে রাজকোটে ব্যারিস্টারী শুরু করেন। ১৮৯৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি মামলা করবার জন্য যান—মামলার কাজ শেষ হবার পর তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের ভোটাধিকার নিয়ে আন্দোলন চালাবার জন্য সেইখানেই রয়ে গেলেন। এই আন্দোলনের ফলে সেখানকার ভারতীয়দের মধ্যে তিনি এক জাগরণ আনেন। ১৮৯৬ সালে কয়েকদিনের জন্য ভারতবর্ষে ফিরে আসেন এবং সে বছরেই আবার 'নাটাল'-এ ফিরে যান। ১৮৯৯ সালে বুয়োর যুদ্ধে তিনি স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়ে তুলে সেবাকার্য্যে যোগ দেন। ১৯০১ সালে ভারতে ফিরে আসেন ও কংগ্রেসে যোগদান করেন কিন্তু আবার দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে যান। ১৯০৬ সালে ট্রান্সভাল গবর্ণমেণ্ট

'এসিয়াটিক অর্ডিন্যান্স' প্রবর্ত্তন করেন—এই অর্ডিন্যান্সে নিয়ম করা হয় যে ট্রান্সভালে ভারতীয়রা ভবিষ্যতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং যারা সেখানে বসবাস করেছে তাদেরও কতকগুলি হীনতা স্বীকার করে থাকতে হবে। গান্ধীজী এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে আইন অমান্য করবেন বলে ভারতীয়দের জানালেন—গান্ধীজীর নির্দ্দেশমত ভারতীয়রা কেউ নাম রেজেস্ট্রি করলে না এবং এই ভাবে ঐ আইনকে অমান্য করলেন। ৮ বছর ধ'রে এইভাবে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন সেখানে চলে। এই আন্দোলনের ফলে গান্ধীজীকে সেখানে তিনবার জেলে যেতে হয়। ১৯১৪ সালে গান্ধীজীর আন্দোলন সফল হলো। ১৯১৫ সালে গান্ধীজী ভারতে ফিরে এলেন, প্রথমে এসে তিনিরবীন্দ্রনাথের শান্তি-নিকেতনে থাকেন—১৯১৬ সালে আমেদাবাদে আশ্রম স্থাপন করেন এবং পরে তাঁর আশ্রম সবরমতীতে স্থানান্তরিত হয়। এর পর তিনি চম্পারণ জেলার ও খেড়া জেলার চাষীদের আন্দোলন পরিচালনা করেও সাফল্য লাভ করেন। ১৯১৯ সালে রাউলাট্ এ্যাক্টের বিরুদ্ধে অহিংসঅসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করেন। এরপরে তাঁর ৬ বৎসরের জন্য কারাদণ্ড হয়—কিন্তু ১৯২৪ সালে এপেণ্ডিসাইটিস রোগ হওয়ার জন্য মুক্তি পান। ১৯৩০ সালে ভারতে আইন-অমান্যআন্দোলন শুরু করেন। লবণ-আইন অমান্য করার জন্য তাঁর জেল হয়। ১৯৩১ সালে মুক্তি পান ও গান্ধী-আরউইন চুক্তি হওয়ার ফলে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়। দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি বিলাত যান। ফিরে আসার পর বড়লাট কর্ত্তৃক গান্ধীজীর সাক্ষাতের আবেদন অগ্রাহ্য হয়। ১৯৩২ সালে আবার আন্দোলন শুরু হয়। গান্ধীজীকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। জেলে তিনি কয়েকবার অনশন করেন। এরপর তিনি হরিজন সংগঠনের কাজে মন দেন। ১৯৩৪ সালে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে দেন, পরে আবার কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৩৭ সালে ওয়ার্দ্ধাতে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের প্রস্তাব সমর্থন করেন। ১৯৩৯ সালে তাঁর নির্দ্দেশ

অনুসারে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস-মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেন। ১৯৪০ সালে তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নূতন রূপ দেন—এবং বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতের পক্ষ থেকে সহায়তা দেওয়ার বিরোধিতা করেন। এর ফলে তিনি কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৫ সালে তিনি মুক্তি পান। ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে মুসলীম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' ঘোষণার ফলে যে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়, তারই পরবর্ত্তী ঘটনা হিসাবে অক্টোবর মাসে নোয়াখালিতে দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধে এবং তার ফলে ঐ জেলায় অত্যাচার ও অরাজকতার বিভীষিকা দেখা দেয়। সেই বিভীষিকার মধ্যে ৭৮ বছরের বৃদ্ধ গান্ধীজী নিজের জীবন বিপন্ন করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইংরাজী ভাষায় 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদনা করতেন ও কয়েকখানি প্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থও লিখেছেন। তিনি হিন্দু হয়েও জাতিভেদ, বর্ণভেদ ও ছোঁয়া-ছুঁয়ির বিচার মানতেন না। তিনি নিয়মিত কোরাণ, গীতা, বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করতেন ও তাঁর জীবনকে সর্বধর্ম্মের সমন্বয়ের আদর্শে গড়ে তুলেছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের পরিচয় কি?

ভারতের নেতা, লেখক ও সাধক। ইনি স্বনামধন্য বাঙালী রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র ও এঁর বাবার নাম ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ। ১৮৭২ সালের ১৫ই আগস্ট কলিকাতায় এঁর জন্ম হয়। সাত বছর বয়সে বাবার সঙ্গে বিলাতে যান, ও সেখানেই লেখাপড়া শেখেন। ১৮৯০ সালে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাশ করেন—কিন্তু ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় ফেল করায় চাকুরীতে মনোনীত হন নি। ১৮৯২ সালে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ট্রাইপোজ্' পাশ করে দেশে ফিরে বরোদা কলেজে অধ্যাপকের চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হন। ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙলা দেশে আসেন ও ১৯০৬ সালে 'ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অফ্ এডুকেশন'বলে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। এর পরে "Bande Mataram" (বন্দেমাতরম্) ও "Karmayogin" (কর্ম্মযোগী) নামে দু'খানি ইংরাজী কাগজের সম্পাদনা

করেন। ১৯০৭ সালে আলিপুর বোমার মামলায় আসামী হয়ে বছরখানেক জেলে থাকেন। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার কিছুদিন পরে তাঁর মত বদলে যায় ও তিনি পণ্ডিচেরীতে গিয়ে সাধনায় রত হন। পণ্ডিচেরীতেই তাঁর আশ্রম গড়ে ওঠে। ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে তিনি তাঁর নিজস্ব মতবাদ প্রচার করেন ও 'আর্য্য' নামে উচ্চাঙ্গের এক দার্শনিক পত্রিকা সম্পাদনা ক'রে দেশবিদেশের বহু মনীষীর শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জ্জন করেন। তাঁর আশ্রমে জ্ঞান লাভের জন্য বর্ত্তমানে দেশ-বিদেশের বহু শিষ্য সমবেত হয়েছেন। তিনি সাধারণতঃ আশ্রমবাসী ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে কথা বলতেন না, বছরে ছয়দিন মাত্র নীরবে তাঁর দর্শনাভিলাষী ভক্তদের দর্শন দিতেন। গত ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে তিনি ইহলোক ছেড়ে গেছেন।

'জওহরলাল নেহেরু'র পরিচয় কি ?

ইনি ভারতের অন্যতম পৃথিবীখ্যাত রাজনৈতিক নেতা। এঁর বাবার নাম পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, মায়ের নাম স্বরূপরাণী নেহেরু—১৮৮৯ সালে এলাহাবাদে এঁর জন্ম হয়। হ্যারো, কেম্ব্রিজ ও লণ্ডন প্রভৃতির বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন ও ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন। ১৯১৮ সাল থেকে ইনি কংগ্রেসে যোগ দেন এবং বহু বছর তিনি কংগ্রেসের সম্পাদকরূপে কাজ করেন। আইন-অমান্য-আন্দোলনে যোগ দেওয়ার ফলে এঁর বহুবার কারাদণ্ড হয়। ইনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সবচেয়ে বেশীবার সভাপতিত্ব করেন। রাজনীতিক হলেও বর্ত্তমানে তিনি পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক বলে পরিচিত—এবং সাহিত্যেও এঁর খ্যাতি সারা জগতে ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯৩৬ সালে তিনি ইংরাজীতে আত্মজীবনী লেখেন, এই বইটি সারা পৃথিবীতে বিশেষ প্রশংসিত হয়। ইনি পৃথিবীর বহুদেশে ঘুরে এসেছেন ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বহুল প্রচার করেছেন। ইনি ইংরাজী ভাষায় বহু ভালো ভালো বই লিখেছেন, তার মধ্যে "Glimpses of The World History", "Soviet Russia", "Autobiography" ও "Discovery

of India" বিখ্যাত বই। ১৯৪৬ সালের ভারতে যে মধ্যবর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয়, সেটির পরিচালনার ভার এঁকেই দেওয়া হয়। বর্ত্তমান স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ভারতের ইনিই প্রধান মন্ত্রী।

'সুভাষচন্দ্রে'র পরিচয় কি ?

ইনি ভারতের অন্যতম বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা হিসাবে জগৎ-বিখ্যাত। এঁর বাবার নাম—জানকীনাথ বসু। ১৮৯৭ সালে ২৩শে জানুয়ারী কটকে এঁর জন্ম হয়। কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ, স্কটিশচার্চ্চ কলেজ ও কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভ করেন। ইনি ১৯২০ সালে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার ক'রে পাশ করেন, কিন্তু তিনি আমলাতন্ত্রের কাজে ইস্তফা দিয়ে ১৯২১ সালে ভারতের জাতীয়-আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২২ সালে তিনি উত্তরবঙ্গে বন্যাপীড়িতদের সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৪ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হন—ঐ বছরেই তিনি কারারুদ্ধ হন এবং কারারুদ্ধ থাকার সময়েই লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। মুক্তির পর ১৯৩১ সালে আবার কারারুদ্ধ হন—বন্দী অবস্থায় যখন ছিলেন তখন তিনি কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩৬ সালে ও ১৯৪০ সালে আবার তাঁর জেল হয়। তিনি দু'বার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের 'হাইকম্যাণ্ডে'র বা 'মাতব্বর'দের সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় তিনি সভাপতির পদ ত্যাগ ক'রে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নাম দিয়ে এক উগ্রপন্থী রাজনৈতিক দল গড়েন। ১৯৪০ সালে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে তাঁর জেল হয় ও অসুস্থ অবস্থায় গৃহে অন্তরীণ হন, তারপর ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে তিনি নিরুদ্দেশ হন—তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায় না, পরে ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেন যে সুভাষচন্দ্র এই যুদ্ধে বিপক্ষ দ'লে যোগ দিয়ে এক্সিস-পক্ষীয় কোনও দেশে বাস করছেন। এর আগে তিনি

পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রে গিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রপতিদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন ও সে সব রাষ্ট্রব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে এসেছিলেন। এদেশ থেকে তাঁর সহসা অন্তর্ধানের ফলে সারা-জগতে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তারপর যুদ্ধ শেষ হবার পর ভারতের সকল সম্প্রদায়ের সৈনিকদের মিলিত করে—তাঁর "আজাদ বাহিনী" বা "স্বাধীন ভারত সেনানীদল" গড়ার গৌরবময় ইতিহাস সবাই জানতে পারে। সে ইতিহাস ভারতবাসীমাত্রেরই গৌরবের সম্পদ। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। প্রকাশ যে তিনি বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন—কিন্তু এখনও তা অনেকে স্বীকার না করে তাঁর শুভপ্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করছেন।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদের পরিচয় কি ?

ইনি ভারতীয় কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি। ১৮৮৮ সালে পবিত্র মক্কা নগরীতে মুসলমান পরিবারে এঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ভারতীয় মুসলমান ও মাতা আরব রমণী, কাজেই আরব দেশেই এঁর শৈশব কাটে। তিনি কায়রোর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তারপর কলকাতায় এসে মুসলমান সম্প্রদায়ের কল্যাণে তিনি আল হিলাল নামে এক উর্দ্দু পত্রিকার সম্পাদনা কাজে ব্রতী হন। তিনি ভারতের খিলাফৎ আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন এবং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দেন। তার ফলে তাঁকে কারাবাস ও পীড়ন ভোগ করতে হয়। ১৯২৩ সালে কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। এবং ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত তিনিই কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। তিনি উর্দ্দু ও আরবী ভাষায় বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ লিখেছেন ও উর্দ্দুতে কোরাণের ভাষ্য লিখেছেন। মুসলিম মনীষীদের মতে বর্ত্তমানে ইসলাম শাস্ত্রে তাঁর মত এত বড় পণ্ডিত জ্ঞানী মুসলিম জগতে নেই। ইনি ভারতের শিক্ষামন্ত্রী।

'সি-ভি-রমনে'র পরিচয় কি ?

ইনি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক—পদার্থবিদ্যায় নূতন তথ্য আবিষ্কার করার ফলে ইনি সারা পৃথিবীতে পরিচিত হয়েছেন। এঁর পরিচয়—১৮৮৮ সালে ত্রিচিনাপল্লীতে এঁর জন্ম হয়—মাদ্রাজে লেখাপড়া শেখেন। ১৯০৭ সালে গবর্ণমেণ্টের ফাইন্যান্স বা অর্থসংক্রান্ত বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। ঘটনাচক্রে স্যার আশুতোষ তাঁর প্রতিভা ও জ্ঞানের সংস্পর্শে আসেন এবং তিনিই জোর করে তাঁকে বিজ্ঞানের শিক্ষাদান ও গবেষণাতে লাগান। ১৯১৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'পদার্থবিদ্যা' বিভাগে 'পালিত অধ্যাপকে'র পদে নিযুক্ত হন। প্রথমে তিনি শব্দতত্ত্ব এবং আকাশের ও সমুদ্রের বর্ণতত্ত্বের রহস্য-সংক্রান্ত গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন ; পরে ১৯২৮ সালে আলোক-তত্ত্বের এক নূতন রহস্য উদ্ঘাটন করেন—যেটি বিজ্ঞান-জগতে 'রমন এফেক্ট' (Raman Effect) ব'লে পরিচিত হয়েছে। ১৯৩০ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান। এ ছাড়া তিনি রোমের বিখ্যাত পুরস্কার 'মেট্টুচি পদক' ও রয়াল সোসাইটির হিউজেস্ মেডেল পেয়েছেন। তিনি পৃথিবীর বহুদেশে বিজ্ঞান-আলোচনা ক'রে খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি বাঙ্গালোরের 'ইন্স্টিটিউট অফ সায়েন্স' বলে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক ছিলেন। ১৯৪০ সালে তিনি আমেরিকার বিজ্ঞান বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার 'ফ্র্যাঙ্কলিন' মেডেল পেয়েছেন।

'সরোজিনী নাইডু'র পরিচয় কি ?

ইনি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালিকা ও কবি। এঁর লেখা ইংরাজী কবিতা সারা পৃথিবীতে আদৃত হয়েছে এবং ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এঁর বাবার নাম অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। ১৮৭৯ সালে হায়দ্রাবাদে এঁর জন্ম হয়। মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে ইনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেন—এর কিছুদিন পরেই তাঁকে ইংলণ্ডে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি লণ্ডনের কিংস কলেজে ভর্ত্তি হন,

সেখান থেকে উত্তীর্ণ হয়ে কেম্ব্রিজের গির্টন কলেজে পড়াশুনা করেন। ১৮৯৮ সালে ইনি নিজাম সরকারের প্রধান চিকিৎসক ডাঃ এম. জি. নাইডু ব'লে এক মাদ্রাজী অব্রাহ্মণ চিকিৎসককে বিবাহ করে সকলকে অবাক করে দেন। প্রথম জীবনে ইনি হায়দ্রাবাদে বন্যা-পীড়িতদের সেবা করার জন্য ইংলণ্ডের রাজার কাছ থেকে 'কাইজার-ই-হিন্দ' বলে স্বর্ণপদক পান। ইনি ভারতের মহিলা-আন্দোলনের অন্যতম নায়িকা ও রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতের মহিলাদের প্রতিষ্ঠা ইনিই করেছেন। ১৯২৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনিই প্রথম মহিলা-সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্বে পৃথিবীর বহু আন্তর্জ্জাতিক সভায় বক্তৃতা ক'রে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন ও তাঁর বাগ্মিতার পরিচয়ে বহুদেশে শ্রদ্ধা পেয়েছেন। ১৯৩১ সালে তিনি রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগদান করেন। রাজনৈতিক কার্য্যের জন্য তিনি একাধিকবার কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। তাঁর লেখা 'The Bird of Time', 'The Broken wing', 'The Golden Threshold' বলে কবিতার বই ইংরাজী ও ফরাসী সাহিত্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ বই বলে গণ্য হয়েছে। তিনি স্বাধীন ভারতে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল থাকা কালে পরলোক গমন করেন।

'রাধাকৃষ্ণণে'র পরিচয় কি ?

পৃথিবী-বিখ্যাত ভারতের অন্যতম দার্শনিক ও পণ্ডিত। তাঁর পুরো নাম 'স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্', ১৮৮৮ সালে মাদ্রাজে তাঁর জন্ম হয়। ইনি মাদ্রাজ ও অক্সফোর্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১৯২৬ সালে ম্যাঞ্চেস্টার কলেজে ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা করেন এবং ১৯৩৬ সাল থেকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যধর্ম্মের অধ্যাপকের কার্য্য করেন। ১৯৩১ ও ১৯৩৯ সালে তিনি জেনেভাতে লীগ অফ্ নেশেন্সের 'ইণ্টার ন্যাশন্যাল কমিটি অফ্ ইন্‌টেলেকচুয়াল কো-অপারেশন' সভায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি বেনারসের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের পদে

অধিষ্ঠিত হন। তিনি পৃথিবীর বহুদেশে ভ্রমণ করেছেন ও ভারতের ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৯৩১ সালে তিনি 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৪৬ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পরিষদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনের প্যারিস অধিবেশনে ইনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। বর্তমানে ইনি ভারতের প্রজাতন্ত্রের ভাইস প্রেসিডেণ্ট।

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত কে?

বর্ত্তমানে ভারতের মহিলা কর্ম্মীদের মধ্যে ইনি সর্ব্বপ্রথম মহিলামন্ত্রী ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নারীবক্তা ও কর্ম্মী হিসাবে এদেশে ও বিদেশে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। ইনি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর ভগ্নী ও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর কন্যা। ১৯০০ সালে এঁর জন্ম হয়। স্বনামধন্য আইনজীবী পরলোকগত আর, এস, পণ্ডিতের সঙ্গে ইনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯৩০ ও ৩২ সালে ইনি কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দেন—এবং কারাবরণ করেন। ইনি প্রাঞ্জল ইংরাজী ভাষায় চমৎকার বক্তৃতা করতে পারেন—এবং নানা বিষয়ে অসাধারণ জ্ঞান রাখেন। তিনি তাঁর পিতা ও ভ্রাতার মত দেশের সেবায় জীবনের অধিকাংশ অংশই অতিবাহিত করেছেন; ১৯৪১ সালে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনে সভানেত্রীত্ব করেন। ১৯৪৪ ও ৪৫ সালে তিনি আমেরিকার বহু জায়গায় ভ্রমণ করেন ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ভারতের পক্ষ থেকে সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে আমন্ত্রিত হন। ১৯৪৬ সালে যুক্তপ্রদেশের অন্যতম মন্ত্রী নিযুক্ত হন। এবং ১৯৪৬ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পরিষদে—দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে ওজস্বিনী বক্তৃতা দিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সমর্থন সংগ্রহ করেন।

'চার্চ্চিলে'র (Churchill) পরিচয় কি?

'চার্চ্চিল' হলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী এবং ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রক্ষণশীল দলের বিশ্ববিখ্যাত নেতা, তাঁর পুরো নাম হচ্ছে

'উইন্স্টন্ লিওনার্ড স্পেন্সার চার্চিল'। ১৮৭৪ সালের ৩০শে নভেম্বর তাঁর জন্ম হয়। তাঁর বাবা হচ্ছেন ইংরেজ লর্ড র‍্যানডল্ফ চার্চ্চিল—মা হচ্ছেন আমেরিকান মহিলা। তিনি প্রথম জীবনে যুদ্ধের সংবাদদাতা হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পার্লামেন্টের রাজনীতিতে যোগ দেন—১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কার্য্য পরিচালনার বিভিন্ন পদে সংশ্লিষ্ট থাকেন। কিন্তু ১৯৩০ সালের পর থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত পর্য্যন্ত তিনি রাষ্ট্রের কোন বিশিষ্ট পদাধিকারী ছিলেন না। ১৯৪০ সালের ১১ই মে তিনি সকল দলের ভোটে প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হন। চার্চ্চিলের পরিচালনায় ইংলণ্ড এই যুদ্ধের ব্যাপারে বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তাঁরই কূটচালের ফলে এই যুদ্ধে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও রুশিয়া এক্সিস-বিরোধী হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বিপক্ষে তিনি একাধিকবার বহু গরম গরম উপদেশ দিয়েছেন। তিনি ছিলেন 'পার্লামেন্টে'র গোঁড়া রক্ষণশীল দলের মুখপাত্র—এই দলটি চিরদিনই ভারতকে বৃটেনের অধীন করে রাখার পক্ষপাতী ছিল।

এইচ্, জি, ওয়েল্‌সের (H. G. Wells) পরিচয় কি ?

এ যুগের অন্যতম চিন্তাবীর, মণীষী ও সাহিত্যিক। তাঁর পুরোনাম 'হার্ব্বার্ট জর্জ্জ ওয়েল্‌স্'। ১৮৬৬ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর তিনি ইংল্যাণ্ডের কেণ্ট প্রদেশের ব্রম্‌লির একটি ছোট্ট মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের পরিবারের অবস্থা ভাল ছিল না বলে 'ওয়েল্‌স্'কে ১৩ বছর বয়সেই স্কুল ছাড়িয়ে এনে এক ডাক্তারখানায় শিক্ষানবীশের চাকুরীতে লাগিয়ে দেওয়া হয়। এখানে বিশেষ কৃতকার্য্য না হওয়াতে—ওয়েল্‌স এক দরজির দোকানে চাকুরী নিলেন। কাজ কর্ম্মের অবসরে এখানেই বসে বসে তিনি পড়াশুনা করতেন। তারপরে কোনও রকম করে নিজের চেষ্টায় ১৮৮২ সালে মিড্‌হার্স্ট গ্রামের স্কুলে ভর্ত্তি হন, এবং সেখান থেকে লণ্ডন ইউনিভারসিটিতে পড়তে যাওয়ার জন্য এক বৃত্তি পান। ১৮৮৮ সালে লণ্ডন থেকে তিনি জীব-তত্ত্বের

গ্রাজুয়েট হন। পরে কিছুদিন তিনি জীবতত্ত্বের অধ্যাপকের কাজ করেন। ১৮৯৩ সালে তিনি সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আসেন। ১৮৯৫ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস "দি টাইম মেশিন" (The Time Machine) প্রকাশিত হয়। ১৮৯৭ সালে তাঁর 'দি ইনভিজিবিল ম্যান' (The Invisible Man) প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৯০৫ সালে তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'কিপস্' (Kipps) প্রকাশিত হয়। ১৯২০ সালে তাঁর Outline of History এক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। তিনি উপন্যাস লেখক ও প্রবন্ধ লেখক হিসাবে সমান খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। ১৯৪৬ সালের ২·শে আগস্ট তিনি পরলোক গমন করেন।

রোমাঁ রোলাঁর (Romain Rolland) পরিচয় কি?

বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক ও দার্শনিক মণীষী। ১৮৬৬ সালের ২৯শে জানুয়ারী ফ্রান্সের 'নিয়েভ্রে' বলে জায়গাটিতে এঁর জন্ম হয়। প্রথম জীবনে ইনি প্যারি সহরে কলা ও ইতিহাস বিষয়ে অধ্যাপনা করতেন। ১৮৯৫ সালে ইনি একটি 'থিসিস' লিখে ফ্রেঞ্চ একাডেমির সদস্য হওয়ার সম্মান পান। ১৯০৪ সালে তিনি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস "জাঁ ক্রিস্তোফ" লিখতে সুরু করেন। ১৯১২ সালে তিনি ২০টি খণ্ডে এই গ্রন্থ শেষ করেন। ১৯১৫ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। আমাদের দেশের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে তিনি অতি সুন্দর বই লিখে গেছেন।

বার্ণার্ড-শ'র (George Bernard Shaw) পরিচয় কি?

ইনি পৃথিবী-বিখ্যাত নাট্যকার, সমালোচক ও সাহিত্যিক। ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই ডাবলিন শহরে এঁর জন্ম হয়। এঁর বাবা ছিলেন কোর্টের সাধারণ কর্ম্মচারী। ছোটবেলায় বার্ণার্ড-শ ডাবলিনের ওয়েস্লিয়ান কনেক্সনাল স্কুলে শিক্ষা পান—কিন্তু ১৪ বছর বয়সে পড়াশুনা ছেড়ে ডাবলিনের এক

জমির দালালের আপিসে চাকুরীতে ভর্তি হন। পাঁচ বছর এখানে চাকুরী করার পর বিরক্ত হয়ে চাকুরী ছেড়ে তিনি ১৮৭৬ সালে লণ্ডনে যান। লণ্ডনে গিয়ে তিনি সাহিত্য রচনার কাজে মন দেন, তবে প্রথম নয়টি বৎসর তাঁর বিশেষ কষ্টে কাটে। ১৮৭৯ সাল থেকে ১৮৮৩ সালের মধ্যে তিনি পাঁচখানি গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্তু কোন প্রকাশকই তা ছাপাতে রাজি হলেন না। যাই হোক সেগুলি সমাজতন্ত্রীদের পত্রিকায় ছাপা হয়। ১৮৮২ সালে তিনি সমাজতন্ত্রী হেনরী জর্জ্জের এক বক্তৃতা শুনে সমাজতন্ত্রবাদে বিশেষ আস্থাবান হয়ে ওঠেন। তারপর তিনি কয়েক বছর ধরে 'পলমল্ গেজেট', 'দি স্টার' প্রভৃতি পত্রিকায় 'কর্ণি দি বাসেটো' (Corni de Basseto) এই ছদ্মনামে লিখতে থাকেন। ১৮৯০ সাল থেকে তিনি 'স্যাটার্ডে রিভিউ' পত্রিকায় G. B. S. এই স্বাক্ষরে নাটক ও রঙ্গমঞ্চের অভিনয় সম্বন্ধে সমালোচনা লিখতে আরম্ভ করেন। তারপর তিনি কয়েকটি নাটক লেখেন। ১৮৯২ সালে তাঁর প্রথম নাটক লেখা শেষ হয়। ১৮৯৮ সালে তিনি তাঁর অদ্ভুত রচনার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৯০৫ সালে তাঁর নাটক "ম্যান এণ্ড সুপারম্যান" (Man & Superman) লণ্ডনের থিয়েটারে অভিনীত হয় এবং তখন থেকেই তাঁর নাটকের বিশেষ আদর শুরু হয়। ১৯২৬ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান এবং সমস্ত টাকা 'এ্যাংলো সুইস্ ফাউণ্ডেশন' বলে প্রতিষ্ঠানকে দান করেন। সাহিত্য রচনায় তাঁর নিজস্ব ব্যঙ্গ ও বাক্‌চাতুরী সমস্ত জগৎকে বিস্ময়ে অভিভূত করে রেখেছে। ইনি ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

'আইন্‌স্টাইন' কে ?

জগৎপ্রসিদ্ধ সুইস্ (অর্থাৎ সুইজারল্যাণ্ডের লোক) পদার্থবিদ্ পণ্ডিত। আলোক তরঙ্গের রহস্য সংক্রান্ত বহু সমস্যার সমাধান করে জগতে বিখ্যাত হন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ্চ জার্ম্মাণীর 'উল্‌ম্' (Ulm) শহরে তাঁর

জন্ম হয়। তাঁর পুরো নাম এলবার্ট আইন্‌স্টাইন (Albert Einstein). মিউনিক শহরে তাঁর বাবার একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির কারখানা ছিল কিন্তু ১৮৯৪ সালে এই কারখানা ইতালীতে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। আইন্‌স্টাইন ছোটবেলায় এক সুইস স্কুলে লেখাপড়া শেখেন। অল্প বয়সেই অঙ্কে তিনি এমন কৃতিত্ব দেখান, যে, তরুণ বয়সেই তিনি জুরিকের (Zurich) এক স্কুলে অঙ্কের মাষ্টারীর চাকরী পান। ১৯০৯ সালে তিনি জুরিক (Zurich) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Ph. D. ডিগ্রি পান এবং ঐ সময়েই তিনি বিজ্ঞানের জটিল গবেষণায় মন দেন। ১৯২০ সাল থেকে জগতের বৈজ্ঞানিক-মহলে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২১ সালে লণ্ডনের 'রয়াল সোসাইটি' সভার "বিদেশী সদস্য" নির্ব্বাচিত হন এবং ঐ বৎসরেই তিনি পদার্থবিদ্যার জন্য 'নোবেল পুরস্কার' পান। তিনি 'নাৎসীবিরোধী' ইহুদী বলে জার্ম্মানী থেকে বিতাড়িত হন। তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীর বলে পরিচিত ছিলেন। ১৯৫৪ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

'হেনরী ফোর্ড' এর পরিচয় কি ?

জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী আমেরিকার বিখ্যাত 'ফোর্ড' মোটর গাড়ীর কারখানার মালিক—১৮৬৩ সালের ৩০শে জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের মিচিগান প্রদেশের 'ডিয়ারবর্ণ' বলে জায়গাটিতে এক গরীব চাষীর ঘরে এঁর জন্ম হয়। ছোটবেলা থেকে এঁর কলকজার দিকে ঝোঁকটা বেশী ছিল এবং ক্রমশঃ সেই খেয়ালই তাঁকে যন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলে। এঁর জীবনী খুব বৈচিত্র্যপূর্ণ, প্রত্যেকেরই পড়া উচিত। ইংরাজীতে এঁর জীবনী অনেকেই লিখেছেন।